মহানগরী

সুশীল জানা





দিগন্ত পাবলিশার্স

প্রকাশক
অজিত দত্ত
দিগন্ত পাবলিশার্স
২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

মূল্য - তিন টাকা

মুদ্রাকর
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

বই প্রসঙ্গে

'মহানগরী'-কলকাতার কানা-গলির কথা এখানে শেষ হলো। এমন কানা মানুষও আছে হয়তো যাদের জীবনে এ গলির কানা দিকটা অত্যন্ত বাস্তব হয়েও আত্মপ্রবঞ্চনায় মিথ্যে হয়ে গেছে। স্বভাবতই মনে পড়ে তাদের আত্মপীডনের কথা। কারণ, কানা হলেও সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর মর্মান্তিক ওই গলিটি ভুলে থাকবে কে' প্রসঙ্গত কথাটি মনে পডলো। যাই হোক, মনে হয় গলিটা তাব অবস্থিতিটুকু অন্তত এখানে জানাতে পেরেছে। এব পরেব পর্যায় 'রাজপথ' — দীর্ঘ দু'শো বছরে কানা-গলি যেখান থেকে মোড নিচ্ছে।

— লেখক

মাতৃ-স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মহানগরী

১

কানা-গলি

মাঠ-প্রান্তরের দেশ শেষ হয়ে গেল। এতক্ষণ রেললাইনের দুইপাশে খাঁ খাঁ করছিল চৈত্রের পোড়া প্রান্তর। বহু দূরে দূরে আকাশে মাথা উঁচু করা নারিকেল আর তালবনের।গ। ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া গ্রামের ইঙ্গিত। স্টেশনে স্টেশনে দেহাতী মানুষের ওঠা-নামা, ভীড় — ক্বচিৎ বাবু-ভাযাদের, তাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল মূর্তিগুলি দেখা গিয়েছে। সে-সব শেষ হয়ে গেল। দেশ বদলে গেল। রূপ বদলে গেল। মানুষগুলোর চেহারা হাবভাবও বদলে যাচ্ছে রেল লাইনের দুপাশে। হঠাৎ যেন মনে হয় — তারা অন্য আর এক দেশের মানুষ। হ্যাঁ — রুজি-রোজগারে ছিটকে এসেছে। কোন্ দেশের কোন্ গ্রাম-প্রান্তর-মাঠ ছেড়ে এসে পড়েছে জীবনধারণের ধাক্কায়।

ট্রেন ছুটেছে হু-হু করে — মুখে এসে লাগছে হাওয়ার ঝাপট্। সুধীর জানালা দিয়ে চেয়ে আছে: মেঠো বাঙলা দেশের প্রান্তরে গ্রামের তাল-নারিকেলবনের উঁচু মাথা ছাড়িয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে কারখানার চিমনী, ঝোপ-জঙ্গলের শতাব্দী-পুঞ্জিত ঘনছায়া আর খড়েব চালা ভেঙে কারখানার কংক্রিট দেয়াল, আর খোলার চালা: মজুর বস্তি, নিরবচ্ছিন্ন কুলি-লাইন — কুলি-লাইন — কুলি-লাইন। চোখের ওপরে সমস্তটা একযোগে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নৈহাটি কাঁকিনাড়া শ্যামনগর ইছাপুর; বস্তির ঘরদোর, চিমনী, মানুষ — অসংখ্য জাতির ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুরুষ। সবটা কেমন ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ — ঘেঁষাঘেঁষি, ঘিঞ্জি। প্রান্তর দেখা উদভ্রান্ত মনের ওপরেও সেই ঘেঁষাঘেঁষির ছায়াপাত হয় — যেন অদৃশ্য শূন্যতা একটা ভরাট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে সুধীবের মনের মধ্যেও। দেশ বদলে গেল। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন কটি ঝিলিক দেয় হঠাৎ। কবে যেন পড়েছিল সে: … গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের শোভা যে দেখে নাই সে নাকি বাঙলার সৌন্দর্য দেখে নাই।— সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার অন্ধকার, জোনাকী, বনজঙ্গল — কোথাকার কোন

মন্দিরে ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ, সে কবেকার এক হারানো ছবির মতো, ছেলে-বেলায় দেখা। আজ মনে পড়ে যায় হঠাৎ। আজও সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তের কোলে, কোন্ এক কারখানার চিমনীর পাশ ঘেঁষে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি নতুন লাইন যেন আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায় সুধীরের মনের মধ্যে : কাঁচড়াপাড়া থেকে কলকাতা — রেললাইনের পশ্চিম-দিকের রূপ যে দেখে নাই!… চিমনী কারখানা কুলি-লাইন — বাঙালী মাদ্রাজী উড়িয়া, পশ্চিম ভারতের অসংখ্য জাতি। ঘন ঘন স্টেশন। স্টেশন-ঘেঁষা কারখানা-কেন্দ্রিক শহর। কালো কালো — নোংরা নোংরা। বোঝা যায় কলকাতা ঘন হয়ে আসছে। ইঁট কাঠ লোহা লক্কড় আর কালো পিচের রাস্তায় নোংরা কলকাতার গন্ধ। ইংরেজ বণিকের কলকাতা — জব চার্নকের কলকাতা, বৃটিশ উপনিবেশের প্রথম রাজধানী — এশিয়ার বিখ্যাত মহানগরী। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, সমতল ভূমির গ্রাম-প্রান্তর নদী-নালা পেরিয়ে আসাম থেকে আবার তবে সেই বহুদিনের চেনা, বহু সুখ-দুঃখের রাজধানীতে।…

শূন্য মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় কতকগুলো ভাঙা এরোপ্লেনের স্তূপ — তারই পাশ ঘেঁষে থরে থরে সাজানো কেরোসিন কাঠের বাক্স উঁচু হয়ে আছে পাহাড়ের মতো। ধসে পড়েছে কোথাও। যুদ্ধের মাল। হয়তো খাদ্যবস্তু এসেছিল কিছু। খালি বাক্সগুলো ওই ভাবে পড়ে আছে — পড়ে থাকবে। ভেঙে ভেঙে পচে খসে তারপর সমতল হয়ে যাবে একদিন। একটা মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে!— আজ হলো উনিশ শ' ছেচল্লিশের মার্চ মাস। কত তারিখ? তারিখটা মনে নেই সুধীরের। ট্রেনের গতিটাকে অসহ্য মনে হচ্ছে তার — দুরন্ত মনে হচ্ছে মুখের ওপরে হাওয়ার ঝাপ্‌টাকে।

গাড়ী এসে থামলো ব্যারাকপুরে। এক গাদা লোক ঠেলে উঠলো কামরার মধ্যে। এক দল হিন্দুস্থানী মজুর, রেলের কুলি, কালি-ঝুল

মাথা। ঘাঘরা-পরা একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে — রাজপুতানীদের মতো। গায়ে আঁটো ব্লাউজ। শুধু ওড়নাটার যা অভাব। বস্ত্র সংকট। আর সেইটুকুর অভাবেই তার দেহের রেখায় রেখায় স্ফুরিত দুরন্ত যৌবনকে মনে হচ্ছে যেন একটা খাপ-খোলা নির্লজ্জ তলোয়ার। বেশীক্ষণ যেন চেয়ে থাকা যায় না। মেয়েটির কোলে একটি কচি ছেলে, এক হাতে আর-একটিকে ধরা। আর এক হাতে খঞ্জনী। হিন্দুস্থানী মজুরবা হল্লা করে ঘিরে ধরেছে তাকে।

সুধীরেব চোখ গিয়ে পড়ে কামরার আর এক কোণে — গ্রামের গুটি কয়েক মানুষ যেখানে বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। কিছুক্ষণ আগে জমি, ফসল আর দুর্ভিক্ষের গল্প করছিল তারা — বলছিল গোরু বেচা-কেনার কথা। — একটি চাষের বলদ দেড় শ' টাকা! কেউ শুনেছে কোনোদিন? তারা চুপ করে গেছে। মিটমিট করে চেয়ে আছে ঘাঘরা পরা মেয়েটির দিকে: সবটা যেন তাজ্জব লেগে গেছে তাদের।

খঞ্জনীতে ঘা পড়লো। মেয়েটি চিকন গলায় ধরেছে জনপ্রিয় একটি সিনেমার গান — গানে পশ্চিমা দেহাতী টান। মজুর কটি হল্লা ক'রে উঠছে থেকে থেকে। একটি লাইন ফিরে ফিরে গাইছে মেয়েটি:

পিযাকা গাঁও চলি গাঁও চলি গাঁও চলি রে।...

কোথায় গাঁও? গ্রাম নয় — কলকাতা — কলকাতা। — সামনে রাজধানী! সুধীরের হঠাৎ মনে হয়, মেয়েটির দুটি ছেলেই কি অবৈধ। মজুর ক'টি ছেকে ধরছে তাকে। তাদের একজন বলে উঠলো:

'আরে চলে ভাইও কলকাত্তা।'

কথার টানে অতি সহজ ঘনিষ্ঠতার আহ্বান — তবু রসিকতার মতো। তারপর একটা হল্লার মাঝখানে মেয়েটির জবাব আর শোনা যায় না। শুধু চোখে পড়ে তার দুটি চোখের ভ্রূ-ভঙ্গি — কিছুটা তাচ্ছিল্য মেশানো, কিছুটা যাচাই করার মতো। ও কি কোনোদিন কোনো গ্রামের কোনো ঘরের

শান্ত-শিষ্ট একটি বৌ ছিল? সুধীর জিজ্ঞাসু চোখে নীরবে চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। আহ্ হা পিয়াকা গাঁও চলি ···

আবার একটা হল্লা ওঠে। হঠাৎ যেন কামরাটা জমজমাট হয়ে গেছে। আট-দশ বছরের ক্ষুদে ক্ষুদে ফিরিওয়ালা-হকার, ওদের কচি মুখে জীবন-সংগ্রামের বিষণ্ণ রুক্ষতা — পঙ্গপালের মতো 'ওয়ার বেবিজ।' ওদের ফিরি-করা কাঁচা গলা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে পাকা ক্যানভাসারদের হেঁড়ে গলার চাপে। এক কোণে মরা গলায় বলদের দর-দাম, অন্য এক কোণে হারাম কোম্পানীকে গালাগাল — স্ট্রাইকের হুমকি, হল্লা — খিস্তি — সেই মেয়েটি গলা ফাটিয়ে গান ধরেছে অন্য আর এক কোণে।

··· না জানে কিধার আজু মেরে নাও চলি রে···

ট্রেনের গতি কমে আসছে আস্তে আস্তে। এবার কলকাতা।··· সুধীরের মনে হয়, গিয়ে দেখবে অনেক কিছু বদলে গেছে হয়তো মহানগরীর ··· খাপছাড়া, আশ্চর্য রকম কিছু। এমনি মনে হয় তার — কিছুদিন কলকাতা থেকে দূরে থাকলে।

ট্রেন কলকাতায় এসে পৌছলো। তখন বিকেল তিনটে।

প্লাটফর্মের বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো সুধীর: কোথায় যাবে আগে, বাড়ি না অফিসে। বাড়ির একটা অবাঞ্ছিত আবহাওয়া কল্পনা করে পা বাড়ালো সে অফিসের দিকে। অফিস তার এক বিদেশী প্রতিষ্ঠান — সংবাদ সরবরাহ অফিস। সেখানে কতকগুলো রিপোর্ট দিয়ে যখন সে বেরুলো তখনও ডালহাউসী স্কোয়ার আর এস-প্ল্যানেড অঞ্চল থেকে কেরানীর দল হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে পড়েনি। মনে মনে সেই সময়টারই কামনা করছিল সে। বাড়ীর সমস্ত পরিজন থাকতো সে সময়ে, বাড়ি ফিরে বাঞ্ছিত না হলেও এমন একটা আব-হাওয়া সে পেতে পারতো যেটার সঙ্গে হয়তো পাঁচ কথায় খাপ খাইয়ে নেওয়া

চলতো সহজেই। কিন্তু তার তখনো দেরি। শেষ পর্যন্ত ঘরমুখো ট্রাম ধরলো সে।

কেমন আছে পরিবারের পরিজনেরা কি জানি! সুধীরের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, একটি অচেনা কাঁচা বয়সের নতুন বৌ — পঞ্চাশ ধবো ধরো বেপরোয়া তার স্বামী, শ্বাসরুগী এক বুড়ী পড়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে, তার পাশে নির্বিকার ভাবে হুঁকো টানছে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। অপরিবর্তনীয় অচল অটল একটা ছবি মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের। তারপর হঠাৎ গোটা জিনিসটাকে যেন মাড়িয়ে দুমড়ে হুড়মুড় করে ছুটে এসে দাঁড়ালো একটি বছর ষোলো বয়সের চঞ্চল মেয়ে:

'কাকু!' ...

গোটা ঘরটার মুখ গোমড়া করা বিশ্রী আবহাওয়াটাকে খান খান করে দিয়ে চেঁচিয়ে নাচিয়ে এদিক ওদিক ছুটে একাকার করে তুলবে সে।

তুলবে কি? কিছুই কি বদলায়নি? মনে মনে সুধীর জিজ্ঞেস করলো। হয়তো বদলেছে, সে জানে না। আটমাস সে কলকাতা ছাড়া — বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই সে রাখেনি। বাড়ির কেউ তার খোঁজও করেনি। যেন সম্পর্কের একটা অতি স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতাকে নীরবে মেনে নিয়েছিল সবাই। তারপর হঠাৎ একদিন একখানি চিঠি পেল সে — সেই চঞ্চল মেয়েটি লিখেছিল: তুমি শুধু একবার এসো — তারপর না হয় চলে যেয়ো। সে চিঠির না ছিল তারিখ, না ছিল ঠিকানা। কলকাতার হেড অফিসের ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছেছিল — তারপর সেখান থেকে ঠিকানা বদলে আসাম।

চিঠি পেয়েই রওয়ানা হয়েছে সুধীর।

রাস্তায় ট্রাম-বাস-প্রাইভেট কারের ভিড়, জনারণ্য পথ, ব্যস্ত মানুষের

চোখে ক্ষুধার গাম্ভীর্য — কলকাতা এতটুকু বদলায়নি কোথাও। সব ঠিক আছে যেখানে যেমনটি ছিল।

দরোজায় ঘা দিল সুধীর।

বাড়ির ঝি বেরিয়ে এলো। নতুন মুখ।

সুধীরের মনে কেমন খট্‌কা লাগে। জিজ্ঞেস করল, 'হরেনবাবুকে চাই। হরেনবাবু থাকেন তো এখানে?'

'হরেনবাবু বলে তো কেউ থাকেন না এখানে!'

'বুঝেছি।' সুধীর একটু ভেবে নিল মুখ নিচু করে: কিছু একটা বদলানো উচিত — নিশ্চয়ই বদলানো উচিত। তারপর বললো, 'তোমরা এখানে কতদিন এসেছ — এই বাড়িতে?'

'তা পেরায় ছ-মাস।'

'তোমাদের আগে যারা ছিলেন এখানে — তাঁরা কোথায় গেছেন জানো?'

'জানিনি বাবু।'

সুধীর অন্যমনে ফিরে এলো বড় রাস্তার ওপরে। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ট্রাম স্টপেজে। ভাবতে লাগলো কোথায় যাবে সে এর পর।

ট্রাম ছুটছে, বাস ছুটছে — কর্মচঞ্চল জনস্রোত — মুখর মহানগরী। ঠিক যেমনটি ছিল। একটু শুধু অদল বদল হয়ে গেছে। কেউ জানে না। একটি পরিবার বাড়ি বদলেছে এর মাঝখানে। মনে হচ্ছে কোথায় যেন ক্ষৌত হয়ে গেছে।

বাড়ি বদলালো কেন? বেশ ছিলো তো বাড়িটা! ভদ্র পাড়া, নতুন ফ্ল্যাট-সিসটেমের বাড়ি, বড় রাস্তার কাছাকাছি!—

শৈলেনের আফিস লক্ষ্য করে ট্রাম ধরলো সে।

বেয়ারার মুখে সুধীরের নাম শুনে শৈলেন অফিস থেকে বেরিয়ে এলো তাড়াতাড়ি।

'কাকু — তুমি!'

সুধীর বললো, 'হ্যাঁ আমি। তোর ছুটির কত দেরি?'

'আসছি — আমি আসছি এখুনি।'

শৈলেন আফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এলো।

সুধীর জিজ্ঞেস করলো, 'সব ভালো?'

শৈলেন মৃদু কণ্ঠে বললো 'একরকম।'

'পুরানো বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে শুনলাম বাড়ি বদলানো হয়েছে। সে কোথায়?'

'কাছাকাছিই। চলো।'—

গলিটা কানা। শেষ হয়েছে খোলার চালের বিরাট এক বস্তিতে। দু-পাশে জব চার্নকের আমলের আদ্যিকালের কলকাতার নিচু নিচু বাড়ি। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। পুরানো বাড়িগুলোর কি খোলা নর্দমার বোঝবার উপায় নেই। শৈলেন চলেছে আগে আগে।

তাকে অনুসরণ করতে করতে সুধীর বলে উঠলো আবার, 'বুঝেছি।'

শৈলেন কোনো উত্তর দিল না — মাথা নিচু করে আগে আগে চলতে লাগলো। তারপর গলির শেষাশেষি এসে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো সে। কড়া নাড়লো।

সুধীর টেনে টেনে বললো, 'এই কানা গলির মধ্যে ঢোকা ছাড়াও আরও কিছু ঘটেছে কি?'

শৈলেনের জবাব দেওয়ার আগে দরোজা খুলে দাঁড়ালো বছর ছাব্বিশের একটি মেয়ে। শৈলেনকে দেখে নীরবে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। শৈলেন তার সঙ্গে একটি কথাও কইল না। ঢুকে গেল সোজা ঘরের ভেতরে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে সুধীরের। সে যেন একটা অপরিচিত লোক — এসে পড়েছে অচেনা একটা যায়গায়।

পেছন থেকে সুধীর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'এই বাড়ি?'

শৈলেন শুধু ছোট্ট করে একটু উত্তর দিল, 'হুঁ।'

কিন্তু রেণু — রেণু কোথায়! অবাক হয় সুধীর। গাম্ভীর্যের বাঁধ-ভাঙা বেণী-দোলানো সেই মেয়েটা গেল কোথায়!

একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে শৈলেন মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, 'রেণু।'

রেণু শুয়ে আছে বিছানায় — বিষণ্ণ পাণ্ডুর। শৈলেনের ডাকে চোখ মেলে তাকালো।

শৈলেন বললো, 'কাকু এসেছে রে।'

'কাকু!' ধড়মড় করে উঠে বসলো রেণু।

শৈলেন ব্যস্ত হয়ে বললো, 'উঠিস নে — শুয়ে শুয়েই কথা বল্।'

'আমার বালিশগুলো পিঠের কাছে দাও দাদা। ওঃ কাকু!'

সুধীর দেখছে রেণুকে — অদ্ভুত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটা। চোখ দুটো ঢুকে গেছে ভেতরের দিকে — রুগ্ন লম্বা ঢংয়ের বুদ্ধিমান মুখখানা হয়ে উঠেছে আরও ধারালো।

রেণুর যক্ষ্মা।

সুধীর আস্তে আস্তে বললো, 'অনেক কিছু হয়ে গেছে তা হলে।'—

সুধীরের হাতের ওপরে রেণু তার রোগা রোগা হাত দুটো তুলে দিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো, 'কত কি যে হয়ে গেল!' অভিজ্ঞতার তিক্ততা ওর কথায়। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'তুমি আবার চলে যাবে কাকু? তুমি আর যেয়ো না।'

'না রে — যাবো না আর।'

রেণু অন্যমনে বললো, 'হয়তো — হয়তো তা হলে আমি বেঁচে উঠবো।— কি জানি!'—

তবু তার আশা হয় — হয়তো সে বেঁচে উঠবে। সুধীরের বুড়ো বাবা-মাও তাকে দেখে খুশি হয় — কারণ তারাও বেঁচে থাকতে চায়। পুরাতন

জীর্ণ চোখে তাদেরও সেই হাঁফ-ছাড়া আশা — সেই আনন্দ : যাক্ শেষ পর্যন্ত সুধীর ফিরে এলো !...

আট থেকে চোদ্দ পর্যন্ত গুটিচারেক ছেলে মারামারি করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

সুধীর বললো, 'এগুলোকে নিশ্চয়ই স্কুল থেকে ছাড়ানো হয়েছে ?'

রেণু জবাব দিল, 'স্কুলই ওদের ছেড়েছে। বেতন না দিতে পারলে' —

'বুঝেছি।'— সুধীর রেণুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'চুরি ? বা বিড়ি-সিগ্রেট ?'

রেণু বললো, 'তা-ও। ওই সুবোধ তো সেদিন কোন্ ফলওয়ালার দোকানে চুরি করতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে।'

সুবোধ — চোদ্দ বছরের বড ছেলেটি প্রতিবাদ করে উঠলো, 'সে তো তোরই জন্যে। তুই বললি'—

রেণু ধমকে বললো, 'আমি চুরি করতে বলেছিলাম ?'

'খেতে ইচ্ছে করছে বলনি — তাই।' — সুবোধ চুপ করে গেল।

ঘরের সবাই চুপ করে গেছে। তবু সবাই আছে — সবাই এসেছে। দরোজার আড়ালে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী — অপেক্ষা করছে, হয়তো তাকেও কেউ ডাকবে। পরিচয় করিয়ে দেবে — এই হলো সুধীরের দাদা হরেন চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, নাম মাধুরী। কিন্তু কেউ তাকে ডাকলো না। সুধীর শুধু সচেতন। একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে যেন।

কিছুক্ষণ পরে হরেন অফিস থেকে ফিরলো। সুধীরকে দেখে হঠাৎ যেন চমকে উঠলো সে। মুখটা কালো হয়ে উঠলো।

সুধীর এগিয়ে গেল। বললো, 'আজ দুপুরে ফিরলাম।'

হরেন মুখে কোনো রকমে একটু হাসি টেনে বললো, 'বেশ বেশ। পুরানো বাসার ঠিকানায় গিয়ে উঠেছিলে নিশ্চয় ?'

'হ্যাঁ — সেখান থেকে আবার শৈলেনের অফিসে।'—

হরেন তারপর কি বলবে যেন খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপন মনেই বলে যায়, 'এ বাড়িটাও মন্দ নয় — ভাড়াও কম। বুঝলে, কেটে যাচ্ছে কোনো রকমে। সব কপাল। বুঝলে। যা হবার হবে।— যাক, চা খেয়েছ? মাধুরী — চা দাও সুধীরকে, চা করে দাও।'

মাধুরী দাঁড়িয়েছিল এক কোণ ঘেঁষে — একটা করবার কিছু পেয়ে যেন বাঁচলো। তারপর রান্না ঘরে ঢুকে কাঁদলো — কি এক অপমানে, নিরুদ্ধ আবেগে।

হরেন গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে।

সুধীর রেণুর কাছে ফিরে এলো।

শৈলেন শুকনো গলায় বলে উঠলো, 'আমি এখন যাই — সন্ধ্যেবেলা এসে নিয়ে যাবো তোমাকে।— না কি?'

সুধীর যেন তার কথা বুঝতে পারলো না। বললো, 'মানে? কোথায় যাবো?'

'আমার মেসে যাবে তো?'

'তুই তাহলে মেসেই এখনও থাকিস?'

'হুঁ।'

সুধীর স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। আশ্চর্য! তার একটি উত্তরের জন্যে সবাই যেন প্রতীক্ষা করছে মুমূর্ষু রেণুর মতো — বাবা, মা, হঠাৎ শান্ত স্তব্ধ কচি ছেলেগুলো পর্যন্ত — এ বাড়ির রুদ্ধশ্বাস গোটা আবহাওয়াটা। সুধীর ভাবছে — অতীত আটটা মাস তার মস্ত বড় একটা কাহিনী নিয়ে তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুধীরের সামনে। শৈলেন — একুশ বছরের সবে কলেজ ছাড়া চাকুরে ছেলে তার বাবার দ্বিতীয় বারের বিয়েটাকে মেনে নিতে পারেনি। সুধীর রেণুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো:

'আমি যাব না — তুই যা শৈলেন।'

শৈলেন চলে গেল।

কয়েকটা মিনিট — তার মধ্যে যেন একটা নাটক হয়ে গেল। রেণু হঠাৎ আবেগে সুধীরের হাত দুটো নিজের দুর্বল মুঠোর মধ্যে নীরবে শুধু চেপে ধরলো। সে যেন মূর্ত একটা জীবন — গভীর জীবন, উষ্ণ, কঠিন। মৃত্যু-শয্যা থেকে প্রাণপণে চেপে ধরেছে শেষবারের মতো।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে। রেণু আবোল-তাবোল বকে চলেছে, অনেক কিছু — অনেক কথা। বলছিল ভালো থাকলে এবারে সে ম্যাট্রিক দিত। না হোক — সেরে উঠে পরের বছর দিতে পারবে। চেঞ্জে গিয়েই সে পড়াশুনো একটু একটু শুরু করবে।

'আমাকে চেঞ্জে নিয়ে যাবে তো কাকু? কোনো পাহাড়ে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে আর কি! আমি জানতুম। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল এবার আমি সেরে উঠবো।'

ষোল বছরের স্বপ্ন। পৃথিবীর সমগ্র রহস্যের বিরাট ভাণ্ডার যেখানে সবে মাত্র তার রূপ রস গন্ধের ঢাকাগুলি খুলতে আরম্ভ করেছে। রেণু সেখানে কথায় কথায় ছুটেছে চঞ্চল প্রজাপতির মতো। যেন শেষ নেই। জীবন কত বড়? রেণু ম্যাট্রিক পাশ করবে, আই. এ. পাশ করবে — তারপর বি. এ., তারপর?—

'বিয়ে করবি।'

'ধ্যাৎ।'···

এবার শুধু পৃথিবী নয়, জীবনও তার গভীর রহস্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। একটি ষোল বছরের মেয়ে সেখানে উঁকি মেরে থমকে দাঁড়ালো — কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না। শুধু একটা নিবিড় শিহরণ: চোখে মুখে বুকে — সর্বাঙ্গে। কি আছে সেখানে? তার উষ্ণ নিঃশব্দ ভাষায় কি আছে? কিছু আছে — কি এক দুর্বোধ্য আনন্দ — কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। আজ সে জানে না। একদিন জানবে তার আনন্দ।

'তুমি কতদিন চলে গিয়েছিলে কাকু ?' রেণু জিজ্ঞেস করলো।

'তা প্রায় মাস আষ্টেক হলো।'

'আমি পড়েছি প্রায় ছ-মাস। কি বিশ্রীই যে কাটতো! আজ কি জানি কেন — বড় ভালো লাগছে কাকু।'

ভালো লাগছে — সকলেরই বড ভালো লাগছে। তাদের সেই ভালো-লাগার দিকে তাকিয়ে সুধীর মনে মনে জিজ্ঞেস করলো, 'কোনটা ভালো লাগছে? সুধীর না তাব টাকা —তার উপার্জন ?'

এবাব থেকে আয় বাডলো এ পবিবারের।

সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত চলে তাডাহুডো আব দাপাদাপি। এ বাড়ির প্রথম অফিসযাত্রী হরেন এবং স্কুলযাত্রী ছোট ছোট গুটি চারেক ছেলেমেয়ের চেঁচামেচিতে সাবা বাডিটা যেন তোলপাড হয়ে ওঠে। সুধীর ফিরে আসার পব ছেলেরা আবার স্কুলে যাওয়া সুরু কবেছে। দশটার পব পায়রার খোপের মতো তিনটে ঘব আর এক চিলতে আবছা অন্ধকার বারান্দা হঠাৎ যেন ঝিম মেরে যায় স্তব্ধতায়। তখন খবরের কাগজ পড়তে পডতে সুধীর এই জীর্ণ বাড়িটাব আবছা অন্ধকার কোণেব অতি সামান্য শব্দটিও যেন শুনতে পায়। শুনতে পায় — পাশের ঘবে শ্বাসরুগী মায়ের গলা সাঁই সাঁই করছে, বান্নাঘবের কোণে মাধুবীর কাঁচের চুডির অলস হালকা আওয়াজ, বুড়ো বাপেব. নির্বিকার হুঁকো-টানার গুবগুর ধ্বনি। সুধীর বাডির শেষ অফিস-যাত্রী। অফিসে বেরোয় ধীবে সুস্থে একান্ত নিঃশব্দে — বাড়িটায় যখন এই কানা-গলির স্তব্ধ দুপুরের বিষণ্ণতা চেপে বসে।

তার তাডাহুডো না-হয় নেই, কিন্তু চেঁচাতেও কি সে জানে না? শীর্ণকায় এই যুবকটিকে কেমন খাপছাডা লাগে এ বাডীর নতুন বৌ মাধুরীর: ধ্যানী বকধার্মিকের মতো সবই সে দেখছে — অথচ বলছে না কিছু, এর চেয়ে খোলাখুলি একটা ঝগডা হয়ে যাওয়া যেন ভালো। বিয়ে করেনি, বয়স

হলো পঁয়ত্রিশ, এ সংসারে টাকা জোগায় সে-ই বেশী। অথচ সে চেঁচায় না—বাপ-চোদ্দপুরুষ তুলে হঠাৎ একটা গালাগাল দিয়ে বসে না মাধুরীকে অকর্মণ্য বুড়ো শাশুড়ির মতো। লোকটা তার এ সংসারের গোটা অস্তিত্বটাকে যেন অপরাধের গুরুভারে দুঃসহ করে তুলেছে। সব সময়ে মনে করিয়ে দেয়—এ সংসারে তার আসা উচিত হয়নি। বিশ্রী লাগে মাধুরীর — কেমন যেন ভয় করে এই লোকটাকে : হঠাৎ কোনোদিন হয়তো অসম্ভব কথা একটা বলে ফেলবে।

এ অসহ্য। একদিন যেন অত্যন্ত দুঃসাহসে সে সুধীরের ঘরের দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুধীর তখন অফিসে বেরুবার উদ্যোগ করছে।

'সুধীরদা!'—

ডাক দিয়েই মাধুরী হঠাৎ যেন জড়সড় হয়ে গেল।

সুধীর একটু অবাক হয়ে তাকালো মাধুরীর দিকে। বললো, 'কি ব্যাপার?'

হঠাৎ কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে মাধুরী — অনেক দিনের ভেবে রাখা কথাগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সে বললো, 'আপনি আজ বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন?'

'ব্যাপার কি নতুন বৌঠান?'

হঠাৎ অস্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠে মাধুরী বলে উঠলো, 'আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন সুধীরদা।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে বলছো কেন?'

'আমার একটি বান্ধবী আসবে, তার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'উদ্দেশ্য?'

'পছন্দ হলে বিয়ে করবেন। কেন করবেন না?' শেষের প্রশ্নটুকুর মধ্যে মাধুরীর একটা একরোখা দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

কিন্তু সুধীর গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

মাধুরী সসঙ্কোচে বললো, 'হাসলেন যে?'

'আনন্দে।' সুধীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'মানুষের স্বার্থ হাসিল করার নতুন নতুন ফন্দি দেখলে বড় আনন্দ হয়। নিজেও আমি স্বার্থপর মানুষ কিনা। সে কথা থাক্। বান্ধবী মানে তোমার কোনো দূরাত্মীয় বোন বুঝি — এবং অরক্ষণীয়া?'

একটা ধারালো খোঁচায় মাধুরীর চোখ দুটো জলে ভরে এলো। নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললো, 'গরীব বাপের বোঝা হয়ে ছিলাম — এখন হয়েছি আপনাদের বোঝা। এ আমি ভালো করেই বুঝি সুধীরদা, আমাদের মতো মুখ্যু মেয়ের মরণ ছাড়া বোঝা সরাবার আর কোনো গতি নেই।'

সুধীর ধারালো গলায় বললো 'কেন — তোমার গতি তো হয়েছে এই সংসারে।'

মাধুরী বললো, 'সেইটে আমার দিনরাত্রির অপমান। আপনাদের এই গরীব সংসারে আপনার দাদা আমাকে বিয়ে করে এনে গুরুতর একটা অন্যায় করেছেন — এ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর সেই বোকামী বা অন্যায়ের বোঝা আপনি বইতে যাবেন কেন?'

মাধুরীর এতগুলি গোছানো কথার সামনে সুধীর হঠাৎ যেন থতোমতো খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাধুরী বললো, 'আপনিও বিয়ে করুন। — তারপর এ সংসারে থাকুন অথবা চলে যান। আমি যে মেয়ের কথা বলছি সে আমার কোনো বোনও নয়, দূর-আত্মীয়ও নয়। ছোট বেলায় ইস্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এ পাড়ায় এসে আবার দেখা। সে বোঝা হবে না — সে চাকরী করে।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মাধুরী — বলতে যাচ্ছিল, শৈলেনের সুস্পষ্ট অস্বীকার, শাশুড়ীর তীক্ষ্ণ বচন এবং সবার ওপরে সুধীরের নীরব

আর্থিক সাহায্য, যেটাকে ত্যাগের বাহাদুরির মতো লাগে — এই সবগুলো তাকে অহোরাত্রি বিঁধছে। কিন্তু এসব কিছুই সে বলতে পারলো না। অলক্ষ্যে একটা বাষ্পাবেগকে বুকের মধ্যে চাপতে লাগলো।

সুধীর চুপচাপ অফিসে বেরিয়ে গেল।

তারপর অফিসগামী ট্রাম। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝখানে কিছুক্ষণ সে নির্বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর যে কথাটি তার প্রথম মনে এলো সেটি হলো এই যে, একটি মুখ্খু মেয়ে অবস্থাগতিকে বুঝেছে — সে একটি বোঝা। তারপর সে প্রশ্ন করলো মনে মনে — মরাই যদি ভার লাঘবের একমাত্র পন্থা বলে বুঝেছ তা হলে মরনি কেন?— না ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ের জীবনের প্রতি দুরন্ত প্রাকৃতিক লোভ। এই তো তার উত্তর! হায়রে জীবন! মনে মনে হাসলো সুধীর, তারপর জোর করে মাধুরীর কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে অফিসের কথা ভাবতে লাগলো। চিফ-এডিটার হরিশ দত্ত কদিন ছুটিতে আছে ; এ কদিন সে-ই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা অফিসেব নতুন ভাবপ্রাপ্ত স্মিথ সাহেব তাব কাজে খুশিই। স্টেনো-গ্রাফার এ্যাংলো মেয়েটির সঙ্গে ভাবী ভাব স্মিথ সাহেবের। এখন গিয়ে দেখবে সে সাহেবের চোখে দস্যুতা আর এ্যাংলো মেয়েটির হাসি-মুখ। মাধুরী বলে কি না তাকে বিয়ে করতে!···

ঘুরে ফিরে আবার সেই কথা এসে পড়ে। মাধুরীর একটা প্রচণ্ড নাড়ায় সবগুলো সকলরবে আজ নড়ে উঠেছে যেন। বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনের পর দিন — হঠাৎ তার মাঝখানে মাধুরী কতকগুলো অসম্ভব কথা বলে ফেলেছে। কিছুই জানে না — এ সংসারের কিছুই জানে না। মাধুরীর বিয়ের আগে শৈলেনও ওই রকম কতকগুলো অসম্ভব কথা বলেছিল একদিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে :

'মা ঠিক এক বছর মরলো। সমস্ত ব্যাপারটায় আমার কেমন ঘেন্না

লাগছে কান্না। তুমি চলে যাও এ সংসার ছেড়ে — একটি পয়সাও আর সাহায্য কোরো না।'

সে বলেছিল, 'কিন্তু চলবে কি করে — সেইটে বল।'

'চলবে না বলেই তো বলছি। তাতে যার বোঝবার দরকার— সে যদি বোঝে।'

অর্থাৎ তার বাবা যদি বোঝে। কিন্তু কোনো কিছুই সে বিয়ে ঠেকাতে পারেনি। সুধীর আসাম থেকে ফিরে এসে দেখেছে সব, বুঝেছে সব। রেণুর রোগশয্যায় বসে সেদিন গোটা পরিবারটার দিকে তাকিয়ে বড় অপরাধী মনে হয়েছিল তার নিজেকে। রেণুর শিয়রের কাছের জানালাটা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল, কানা গলির শেষে বস্তি থেকে বাড়িটা তাদের আর কয়েক হাত মাত্র ব্যবধানে। আর—

রেণু মরে গেছে। সেই একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে।

অফিস। তাকে দেখে তার সহকর্মীরা মৃদু কলরব করে উঠলো: 'গরম গরম খবর আজ।'—

একজন বলে উঠলো, 'বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ — সাত জন মরেছে অনশনে। গ্রামের মানুষ আবার বেরিয়ে পড়েছে পথে।'

ভাবনার নিঃশব্দ ধারাটা ভেঙে গেল। সুধীর নিরস কণ্ঠে বললো, 'পথ নেই — কানা-গলি। মৃত্যুই তো স্বাভাবিক।'

সুধীরের মন্তব্যের প্রতিবাদেই যেন অবনী রায় বলে উঠলো, 'দেরাদুনে গুর্খা সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে।'

'বিদ্রোহ করেছে — থেমে যাবে।' চেয়ার টেনে বসতে বসতে অলস কণ্ঠে সুধীর বললো, 'তোমার মন তো পড়ে আছে ফেব্রুয়ারীর সেই নাবিক বিদ্রোহে। জানো তো, তারা সবাই জেলে — মুলান্দ ক্যাম্পে এখন অনশন করছে।'

'আবার হবে।'

সুধীর উত্তরে নিঃশব্দে একটু হাসলো।

আর একজন বলে উঠলো, 'ঢাকার শ্রমিকদের ওপরে গুলি চলেছে — মরেছে চারজন, ষোলজন জখম।'

বিচলিত ভারত — আলোড়িত ভারত। অচেনা অজানা জায়গাগুলো যেন বুক চিতিয়ে ছুটে আসছে — তার খবর আছে, তার কথা আছে। সংবাদের ঝড়।

অবনী কি যেন বলতে যাচ্ছিল — তাকে থামিয়ে দিয়ে সুধীর বললো, 'থামো অবনী — থামো। বাপস্ — ধর্মঘট, গুলি, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ — ম্যালেরিয়া জরের ঝড় যেন। কুইনিন দাও — কুইনিন।'

অবনী নয়া দিল্লীর ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নিন আপনার কুইনিন। দেখুন নেতারা কি বলে — লাট সাহেব আর কেবিনেট মিশন কি করে।'

নয়া দিল্লীর ফাইলটা টেনে নিল সুধীর হেসে।

সেখানে একান্ত শান্তিতে চলেছে আলোড়িত ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর — কূটনীতি আর ক্ষমতালোভীর কৌশল, নেতাদের ব্যস্ততা আর বিবৃতির ঝড়। তাব মাঝখান থেকে সুধীরের হাতে উঠে এলো কাশ্মীরের এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট। প্রজা বিদ্রোহ — শতাব্দীর শৃঙ্খল ছিঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নোংবা মানুষের দল। স্বাধীনতা চায়।

ছেঁড়া কাগজেব টুকরিতে সেটা ফেলে দিতে দিতে সুধীর আস্তে আস্তে বললো, 'একটা বিপ্লবের বড় দরকার আমাদেব।'

একহাতে প্রজা বিদ্রোহের রিপোর্ট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে অথচ মুখে এই কথা! ব্যাপারটা অবনী লক্ষ্য করে দমে যায়। তারপর মুহূর্তেই আবার উৎসাহিত হয়ে বললো, 'ঢাকার খবরটা তা হলে'—

'ওসব টেনে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দাও অবনী। আমরা চাই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক খবর। যেমন নেতাদের সহযোগিতার খবর, মিশনের

খবর। এই আমাদের নীতি। এর বেশী কিছু জানাবার থাকলে ওইখানে যাও।' — বলে সুধীর স্মিথ সাহেবের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

অবনী মুষড়ে চুপ করে গেল। তবু নিচু গলায় মৃদু একটু প্রতিবাদ করে বললো, 'একটি শ্রেষ্ঠ সংবাদ প্রতিষ্ঠান এই খবরগুলি চেপে যাবে!'

'আরও অনেক খবর ছিল অবনী।' সুধীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'কলকাতার একটা কানা গলি আছে — তারও অনেক খবর ছিল।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, 'গরম কোথাও কিছু নেই অবনী — আমরা সবাই পরম সুখে ও শান্তিতে আছি এবং চাকরী করে যাচ্ছি ভারতের সেরা এ সংবাদ প্রতিষ্ঠানে। পারো তো এই কথাটা চেঁচিয়ে বলো।'

সুধীরের কথায় একটা বাঁকা বিদ্রূপ আর উষ্ণতা। সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ — লোকটাকে যেন বোঝা যাচ্ছে অথচ ঠিক ধরা দিচ্ছে না। সকলেরই মনে হয়, কোথায় কি যেন একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার একান্ত গোপন কোণ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। তারপর সবাই চুপ করে যায়। কাজে মন দেয়। মাথার উপরে ফ্যানটা ঘুরছে হাওয়ার শিস্ দিয়ে দিয়ে। দরোজার পাশে সামান্য একটু আড়ালে একটি বেয়ারা ঢুলছে নিঃশব্দে। আর কেউ কোনো কথা বলে না। কাজে মুখ নীচু করে সবাই।

তারপর পাঁচটা বাজলো। অফিস ছুটির পালা। সকলের সঙ্গে সুধীরও বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে।

অবনী বললো, 'আজ যে এত তাড়াতাড়ি চললেন?'

চিফ এডিটারের অনুপস্থিতির কদিন সুধীর সকলের শেষে অফিস থেকে বেরুতো — থাকতো সন্ধ্যে পর্যন্ত। কিন্তু আজ যখন সে বেরিয়ে পড়লো তাতে তাড়াতাড়িই বাড়ি ফেরা হয়। সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে যেন তার নিজেরই অজ্ঞাতে নির্জ্ঞান মনের তাড়ায়। এখন মনে পড়লো

মাধুরী তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে বলেছিল বটে। তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে হবে, পছন্দ হলে বিয়ে করে ফেলতেও হবে।

'চলো যাই এক সঙ্গে।' সুধীর অন্যমনে বললো, 'কাল থেকে তো আমার বাদশাহি শেষ। চিফ এডিটার কাজে যোগ দেবে। ভালো লাগছে না।'

ওরা ট্রাম ধরলো।

জানালার ধার ঘেঁষে বসে একান্ত নিঃশব্দে সুধীর আবার ডুবে গেল তার কানা-গলির অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে।

অবনী বক্‌বক করে চলেছে সমানে, 'খবর যতোই চাপুন — আসল জিনিস ফেটে বেরুবে একদিন।'

সুধীর অন্যমনস্কের মতো শুধু বললো, 'হুঁ।'

অবনী হাত নেড়ে বললো, 'দেখবেন একদিন আপনি। ধোঁকা কতদিন চলবে?'

সুধীর কোনো উত্তর দিল না।

অবনী আরো কয়েকবার কথা চালাবার চেষ্টা করে সুধীরের কোনো সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেল।

সুধীর যে স্টপেজে নামে সেটা ছাড়িয়ে গেল।

অবনী বললো, 'নামলেন না?'

'নাঃ, বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি আজ। চলো তোমার বাসায় যাই।'

'চলুন।'

সুধীর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, 'অবনী, বিয়ে করেছ?'

'না। আমার উপর এক দাদা আছেন, একটি বোনও আছে — তাদের বিয়ে হয় নি।'

'প্রেমে পড়েছিলে কোন দিন?'

'পড়েছিলাম — কলেজে।' অরনী একটু হেসে বললো, 'চাকরীতে ঢুকে বাদ দিয়েছি।'

'গুড।' সুধীর তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, 'পকেট সামলাও।'

তারপর দু-জনেই হেসে উঠলো।

সেদিন সুধীর বিকেলটা এড়িয়ে গেল। কিন্তু পরের দিন ঠিক অফিস যাওয়ার মুখে মাধুরী তেমনি সুধীরের ঘরের দরোজার সামনে সসঙ্কোচে এসে দাঁড়ালো আগের দিনের মতো। বললো :

'আমার কথার কোনো জবাব পাইনি সুধীরদা।'

সুধীর বিব্রত হয়ে বললো, 'জবাব কি কোনো আছে? সবটাকে আমার শুধু অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে মাধুরী।'

'অসম্ভব কেন বলছেন? সবাই তো বিয়ে করছে।'

'আর আমি হেসেছি।' সুধীর তার কথার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা ফিরে পায়। হেসে বললো, 'হিসেবী বলে খ্যাতি আছে আমার। কিন্তু আমাদের সংসারের জমা-খরচের হিসেবটা কোনো দিনই মেলাতে পারিনি আমি।'

মাধুরী বললো, 'কিন্তু আমার মনে হয় মেলে। আমার মত মুখ্যু মেয়ে তো সে নয় — চাকরী করে, বোঝা সে হবে না।'

সুধীর এ কথার কোন জবাব চট করে খুঁজে পায় না। হঠাৎ যেন মনে হয় — গরমিলের অন্ধ গোলোক-ধাঁধার মধ্যে হয় তো পথ আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে সে বললো, 'আমাকে একটু ভাববার সময় দাও মাধুরী। দু-একবার উড়ো কথা উঠেছে বটে — হিসেবের ঝড়ে তাকে উড়িয়ে দিয়েছি।' বলে সে হাসলো। বললো, 'তোমাদের বিয়ের আগে যেমন উড়ো কথা একটা উঠেছিল — বিয়ে করতে হলে আমারই করা উচিত, দাদা আর কেন।'

মাধুরীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো হঠাৎ। বললো, 'আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন ফের।'

'এড়িয়ে যাচ্ছি — না? কিন্তু অমন করে আগে কেউ জবরদস্তি তো করেনি মাধুরী। যাই হোক আমাকে একটু সময় দাও ভাববার।'

'বেশ ভাবুন। কিন্তু আলাপ করতে দোষ কি?'

'না, তা কিছু নেই।'

'তবে আজ ফিরবেন তাড়াতাড়ি?'

'চেষ্টা করবো।'

'না না — ওসব উড়ো কথা না। নিশ্চয়ই ফিরবেন।' মাধুরীর কথায় ব্যগ্রতা, ঐকান্তিকতা। তার লজ্জা, তার অপমান — যেগুলো এই সংসারে সুধীরের নীরব উপস্থিতিতে তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে বাজে মাধুরীকে, তার শেষ সে যেমন করে হোক যেন করবেই।

সেদিন সুধীর তাড়াতাড়িই ফিরে এলো।

মাধুরীর বান্ধবীর নাম জয়ন্তী। জয়ন্তী সান্যাল। প্রথমে ভেবেছিল সুধীর — মেয়েটি হয়তো হবে শুকনো খট্‌খটে কোনো স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, — বাঙালী মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে। কিন্তু সে ক্ষেত্র ডিঙিয়েও যেসব মেয়েরা অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করতে শুরু করেছে জয়ন্তী তাদেরই একজন। দশটা-পাঁচটা অফিস করে — ছেলেদের মতো ঠেলাঠেলি করে ট্রামে-বাসে যায়।

মাধুরী জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগলো আমার বন্ধুকে সুধীরদা?'

'ভালোই তো।' বলে সুধীর গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলে।

ঈষৎ চওড়া চিবুক আর চোয়ালটা কিছুটা চৌকো — সবটা এনে দিয়েছে মুখে এক ধরনের নিঃশব্দ কাঠিন্য আর চাপা একটা প্রতিজ্ঞার আভাস। ছিমছিমে কিন্তু কর্মক্ষম শরীর। বাঙলা দেশের স্বাভাবিক ময়লা

রঙের ওপরে মসৃণ স্নিগ্ধতা। সবার ওপরে বড় কথা — সে চাকরী করে। টেলিফোন গাল। সুধীরের ভালোই লেগেছে।

মাধুরী বললো, 'পছন্দ হয়েছে যখন — তখন বিয়ের কথা তোলা যেতে পারে বোধ হয়?'

সুধীর হঠাৎ অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বললো, 'দোহাই মাধুরী, ভেবে-চিন্তে আগে হিসেব মেলাতে দাও। তারপর যা বলবার আমিই তাঁকে নিজে বলবো একদিন।'

'হিসেব মেলাবেন?' বলে মাধুরী হাসলো।

সুধীর বললো, 'বেখাপ্পা শোনায় হয়তো — কিন্তু হিসেবই আমাকে করতে হবে মাধুরী। আমাদের মধ্যে এমন কিছুই হয়নি যে, অন্ধের মতো আবেগে কিছু একটা করে ফেলবো। আর আমার হয়ে কেউ কথাবার্তা চালাক এও আমি চাইনে।'

'বেশ। আপনার হিসেব-নিকেশটা একটু তাড়াতাড়িই সেরে ফেলুন তা হলে।'

সদাসঙ্কুচিত ভীরু মাধুরীকে অনেকখানি হাল্কা মনে হয় আজকাল।

সুধীর বললো, 'কিন্তু একটা কথা তার আগে আমার জানা দরকার। এ বিয়েতে মেয়ের সম্মতি।'

মাধুরী মৃদু একটু হাসলো। 'বললো, 'বয়স বাড়ছে -- বিয়ের ইচ্ছে, ঘর-সংসার, স্বামী কোন মেয়ে না চায়। ওই জায়গায় সব মেয়েই বড় দুর্বল সুধীরদা। যাক সে কথা। আপনি যেন বেরিয়ে যাবেন না। আজ শনিবার — জয়ন্তী এখুনি এসে পড়বে। আমাদের একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন আজ।'

'সর্বনাশ!' মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলো সুধীর। বললো, 'আজ বিকেলে আমার যে এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল মাধুরী — একটা রিপোর্ট, মানে — একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম দেখছি।'

হঠাৎ একগাদা জরুরি কাজের কথা জড়ো করে ফেললো সুধীর। তাড়াহুড়ো করে কোনো রকমে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মাধুরী মুখ টিপে হাসলো। মনে মনে বললো — 'হিসেবী লোক!'

এই লোকটাকে আগে কেমন ভয় করতো — এখন করে না। তবু দুঃসহ লাগে এই অবিবাহিত লোকটার নীরব উপস্থিতি।

কিছুক্ষণ পরেই জয়ন্তী এলো। মাধুরী তখনো হাঁ করে চেয়ে আছে জানালা দিয়ে। পেছন থেকে জয়ন্তী বললো, 'কি দেখছিস অতো?'

'সুধীরদাকে। যেই শুনেছেন তুই আসবি — অমনি পালালেন।'

'কেন!'

'মনে মনে যদি বেহিসেবীর মতো দুর্বল হয়ে পড়েন — এই ভয়েই হয়তো।'

তারপর দু-জনেই হেসে উঠলো একসঙ্গে।

জয়ন্তী বললো, 'উনি কি খুব আদর্শবাদী-টাদি নাকি?'

'এক ধরনের।' মাধুরী হেসে বললো, 'অবিশ্যি বাইরে দেখান মস্ত বেপরোয়া, অন্য রকম। কিন্তু এবাড়ীর এমনি আবহাওয়া যে বারে বারে ধরা পড়ে যান।'

তারপর সে জয়ন্তীর বছর তিনেকের ভাইটাকে ছোঁ-মেরে লুফে নিয়ে বললো, 'ওরকমের লোক সর্বত্র ধরা পড়ে যায় আর কোণ খোঁজে। জানি তো! ওই রকম আর একজন হচ্ছেন আমার বাবা।'

তারপর সে বাচ্চাটাকে চুমু খেয়ে অস্থির করে তোলে। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত ভয়েই যেন কেঁদে ফেলে।

তার ব্যাপার দেখে জয়ন্তী একটু হেসে চাপা গলায় বললো, 'পরের ছেলেকে নিয়ে তো দেখি পাগল হয়ে উঠিস — আবার এদিকে নিজের বেলা তো শুনি কড়াকড়ি খুব।'

মাধুরীর মুখটা মুহূর্তের জন্যে কঠিন হয়ে উঠলো। বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললো, 'কড়াকড়ি — না? তোর চাকরিটা সখ, না প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন।'

'আমারটাও ঠিক তাই।'

'তুটো কথা সমান হলো?'

'আমার কাছে সমান। আমার মতো অবস্থায় পড়লে বুঝতিস।'

তারপর তু-জনেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। লঘু আলাপের সবগুলো সুর কেটে যায়। এ বাড়ীর জমাট অবরুদ্ধতা হঠাৎ চেপে আসে যেন।

মাধুরী বললো, 'মানুষের ওরকম এক-একটা পাগলামি থাকে — বাদ দে ও-কথা। সুবীরদার কাছে বিয়েটাও তো একটা সখ।'

'বুঝেছি প্রেরণাটা কোথা থেকে পাওয়া।' বলে জয়ন্তী একটা কটাক্ষ করলো।

জয়ন্তী জানে না — সে একটা হিসেবে চলা, সন্তর্পণে পা ফেলা হাঁফ-ধরা অনিবার্য জীবন। মাধুরী সেটাকে জোর করে যেন ঠেলে দিল তু-হাতে। বললো, 'যাক সে কথা। চল ছাদে যাই।'

কলকাতার কলরবমুখর আকাশ বিকেলের বিষণ্ণ ছায়ায় তখন ম্লান হয়ে আসছে। কর্মচঞ্চল কোলাহলমুখর শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে এ পাড়াটা অনেক দূরে। এখানে চঞ্চলতা নেই — চঞ্চলতার শব্দতরঙ্গগুলিও এখানে এসে পৌছয় না। বিকেলের বিষণ্ণ ঠাণ্ডা আকাশের মতো ক্লান্তিকর একটা নিঃশব্দতা ঘন হয়ে আছে এখানে সব সময়ে। তবু বিকেলের দিকে প্রকাণ্ড আকাশটার তলায়, নিচু ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে মাধুরী মর্মে মর্মে বুঝতে পারে, যত দূরেই হোক — বিরাট একটা জগৎ আছে। তার প্রাণ-চঞ্চলতা, তার কর্ম-কোলাহল মাধুরীর নাগালের বাইরে। এ যেন সেই পুরাতন বাপের বাড়ীর গ্রামের জীবন — শব্দহীন, তরঙ্গহীন — মন্থর সময়

আর জীবন। তবু সেখানে একদিন স্বপ্ন ছিল। এখানে সেগুলো ভেঙে গেছে।

মাধুরী হঠাৎ একটা হাত চেপে ধরলো জয়ন্তীর। বললো, 'এই, সুধীর দাকে বিয়ে করবি?'

জয়ন্তী হেসে বললো, 'কি পাগল! হাত ছাড়। বেশ — আমি তোর সুধীরদাকে বলবোখন।'

'ঠাট্টা না। তুই বলবি কেন? সুধীরদাই বলবে।' মাধুরীর কথায় কাকুতি। বললো, 'তুই এলে বড ভালো হয় জয়ন্তী। এ বাড়ীর এত লোকজন — কিন্তু তবু বড একা মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, একটা যদি চাকরি করতুম তোর মতো!'—

'এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলি নাকি!'

'সুধীরদা বলেন — এখানে সবাইকেই হাঁপিয়ে উঠতে হবে। কানা গলির নাকি পথ নেই।'—

'বাবা, রাখো তোমার সুধীরদার কথা।'

'বেশ আর বলবো না।'

তারপর দু-জনেই হেসে উঠলো।

জয়ন্তী যেদিন আসে সেদিন বিকেলের এই সময়টুকু মাধুরীর ভরে ওঠে অবরুদ্ধ প্রাণের বাঁধভাঙা উচ্ছলতায়। বাইরের প্রকাণ্ড একটা জগৎ — তার আশা, স্বপ্ন-কথা, বহুদূর কল্পনার সমস্ত স্মৃতি আর বিস্মৃতি যেন বহন করে আনে জয়ন্তী। মাধুরীর মনের বন্ধ দুয়ারগুলো সব খুলে যায় একে একে। জয়ন্তীকে সে আবেগে মনে মনে জড়িয়ে ধরে দু-হাত দিয়ে।

জয়ন্তী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, 'অফিস থেকে ফিরে বিকেলটা বড় একা একা লাগে — ঘরে যেন দম আটকে আসে। তাই পালিয়ে আসি তোর এখানে। কিন্তু তোর সুধীরদার কথা শুনে শুনে আর আসতে ইচ্ছে করে না। ভদ্রলোক অমন কেন! খারাপ ছাড়া কিছু দেখতে পান না নাকি!'

'বড্ড হিসেবী যে।'— মাধুরী যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বললো।

'কাঁচকলা। তোর এই সংসারটুকু — এই ঘরকন্না, টুকিটাকি গিন্নিপনা আমার তো বেশ লাগে। আমি হলে ওই হিসেবী লোকটিকে বলতুম — মশাই ঘ্যান ঘ্যান করবেন না — চলে যান।'

মাধুরী হেসে বললো, 'তোর সংসার যখন হবে তখন দেখা যাবে।'

'দেখাব।' জয়ন্তী অন্যমনে বললো, 'খেটেখুটে জীবনকে কি সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় না ?— যায়। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই কাজ করবে, রোজগার করে এনে নিজেরা মনের মতো করে সংসার গড়বে।'—

মাধুরী চপলকণ্ঠে বললো, 'শুনি তবু কেমন হবে সেটা। ভেবেটেবে রেখেছিস দেখছি।'

মাধুরীর চাপল্য কিন্তু এতটুকু স্পর্শ করে না জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর আবিষ্ট চোখে বলিষ্ঠ এক আগামী জীবন, কণ্ঠে নিবিড় ঐকান্তিকতা। তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধ্যানমগ্ন জীবন একটা হঠাৎ আজ ধ্যান ভেঙে যেন সামনে এসে দাঁড়ায়।

জয়ন্তী বলে চললো, 'কেন হবে না ? স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই খেটেখুটে আনবে, সংসারের সমান দায়িত্ব থাকবে দু-জনের, থাকবে বিশ্বাস, পরস্পরের নির্ভর — ভালোবাসা।'

— শুধু এই মূলধন নিয়েই সংসারকে, জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে জয়ন্তী। দিন রাত্রিকে সে অংশে অংশে ভাগ করে ফেলে। সকালে অফিসে বেরিয়ে যাবে দু-জন, বিকেলে একই সঙ্গে দু-জন ফিরে আসবার চেষ্টা করবে। এসে স্নান সেরে চা খাবে — গল্প করবে অথবা বেড়াতে বেরিয়ে যাবে। ফিরে এসে টুকিটাকি রান্নাঘরের কাজ। তারপর যে কেউ একজন পড়বে কিছু — আর একজন শুনবে। কিছু সাহিত্য, কিছু ইতিহাস — দুনিয়ার খবর বা অন্য কিছু। কোনোদিন গান গাইবে সে — ঘরের আলো তখন নিভিয়ে দেবে।

'ছেলেপুলে থাকবে না ?' — মাধুরী জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ— ছেলেপুলে অবশ্য হবে। মাত্র দুটি ছেলেমেয়ে। জয়ন্তী নিজেই পড়াবে তাদের। সারা বছরের একটানা এই কাজের পর জীবন হয় তো একঘেয়ে হয়ে উঠবে। তখন বেরিয়ে পড়বে বাইরে কোথাও — কোনো পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে। এই বাইরে যাওয়ার জন্যে সারা বছর অল্প অল্প করে সঞ্চয় করবে তারা। বছরে একবার লম্বা ছুটি নেবে। তারপর সেই বাইরে গিয়ে কোনো নিয়ম না, শৃঙ্খলা না, বাধাবন্ধন না।

'কিন্তু লোকটা যদি এক নম্বর কুনো হয় ? বলে — এসো চুপচাপ বসে গল্প করি।' ব'লে মাধুরী হাসলো।

'তাকে ধাক্কা মেরে নিয়ে যাবো। কোণেই যদি থাকবো তা হলে বাইরে যাওয়া কেন ?'

—সারা বছরের ক্লান্তি ভাঙতে হবে, ঘেরাটোপের জীবনটাকে মুক্ত আকাশ, আলো হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ছেলেমেয়েরা ধুলোকাদা মাখবে—। মাখুক। ছুটোপাটি করবে— করুক। সে ক'দিন কোনো কাজ না।

লোকটা যদি কুনোই হয় তা হলেও তাকে হিড হিড করে টেনে নিয়ে যাবে পাহাড়ে, ঝর্ণায়, ঢেউয়ে।

সে এক স্বপ্নের জালবোনা কথায় জয়ন্তীর চাব্বিশ বছরের সমগ্র জীবনের কামনা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। মাধুরী তার সামনে স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। সে এক উজ্জ্বল জীবন — সে এক অফুরন্ত প্রাণ।

মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'বিয়ের আগে আমিও যে কত কি মাথামুণ্ডু ভাবতাম।'—

মাধুরীর কথা যেন শেষ হয় না, তবু সে থেমে গেল। তার পরে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যায়। তারই সকরুণ রেশটুকু কলকাতার ক্লান্ত এই সন্ধ্যায়, নির্জন এই ছাদের এক কোণে যেন এক বুভুক্ষিত আত্মার মত ঘুরতে থাকে।

সেই বুভুক্ষিত আত্মার সামনে সমস্ত সংশয় অনিশ্চয়তাকে ভেঙে ফেলে নিজের সমগ্র জীবনের কামনাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই যেন জয়ন্তী মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলো, 'না — জীবনকে আমি ব্যর্থ হতে দেবো না।' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'আরও বছর খানেক আমাকে কষ্ট করতে হবে মনে হয়। আমার পরের ভাইটা বি.এ. পাশ করে বেরুবে এই বছর। তখন তার চাকরি-বাকরি জুটে যাবে একটা।'

মাধুরী হঠাৎ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'জয়ন্তী, কারুকে তুই ভালোবেসেছিস্?'

জয়ন্তী মৃদু তদ্‌গত কণ্ঠে বললো, 'নাঃ। আর আমাকেও ভালোবাসেনি কেউ। গরীব বাঙালীর মেয়ে, অতো সুযোগ হয়নি। যখন জানতাম না প্রায় কিছুই — তখন এইটুকু বুঝতাম যে, আমাদের সমাজে ওটা একটা পাপ — ঘেন্নার কথা। সবই যখন জানলাম আর বুঝলাম, তখন আমাব দায় আর দায়িত্বটাই হয়ে উঠেছে সব চেয়ে বড। তবু — আমার স্বামী যে হবে সে আমার মধ্যে ভালোবাসার কিছু নিশ্চয়ই পাবে। আমিও ভালোবাসবো।'

কথায় কথায় গোটা আবহাওয়াটা যেন গুরুভার হয়ে আসে। কি যেন একটা টন্‌টন্ করে মাধুরীর বুকের ভেতরে। হয়তো তা ব্যর্থতা — হয়তো সে এক অনাগত জীবনের স্বপ্ন। তারও যেন মনে হয় আজ — তারও মধ্যে ভালোবাসার কিছু ছিল, কিছু থাকবে। কেউ তাকে ভালোবাসবে।

কথায় কথায় আজ জয়ন্তী নতুন এক জগতের দুয়ার খুলে দিয়ে গেল মাধুরীর চোখের সামনে। তার চলে যাওয়ার পরেও, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই অদৃশ্য অথচ উজ্জ্বল মূর্তিমান জগতটার দিকে চোখ তুলে যেন সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সেখানে আছে অজ্ঞাতপূর্ব এক আনন্দ-কোলাহল — জীবনের মত্ততা। তার শব্দ তরঙ্গের আঘাতগুলি মাধুরীর মনে সৃষ্টি করে শুধু সকরুণ সুরের রেশের মতো একটা মূর্ছনা। শুধু তার মনে হয় — সব কিছুই তার নাগালের বাইরে, এ শুধু চেয়ে চেয়ে

দেখা। — চোখ নামক মাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের ভোগের ব্যাপার। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। ছেলের দল খেলাধুলো সেরে ফিরে এসেছে — চেঁচামেচি করছে, স্বামী বসে আছে চায়ের জন্যে — খেয়েই বেরোবে টিউসনীতে। শৈলেন এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার পর টিউসনী করছে স্বামী। অসংখ্য এলোমেলো চিন্তায় মাথা ভরে আসে তারপর মাধুরীর। জয়ন্তী, সুধীর — একটা অনাগত জীবন — হরেন, চা। ··· একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার গিয়ে ঢোকে সে রান্নাঘরে। তারপর হঠাৎ কেমন দম বন্ধ হয়ে আসার মতো মনে হয় তার — চোখে জল এসে পড়ে। মনে মনে বলে: জয়ন্তী, জীবনে তুই সুখী হ' ভাই। তারপর রান্নাঘর, ছেলেদের চেঁচামেচি আর সংসারের টুকিটাকি অসংখ্য কাজ, তার মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যায় সেদিনের বেদনামথিত সন্ধ্যাটি মাধুরীর।

শুধু সচেতন থাকে, সুধীর তখনও ফেরেনি — সুধীরের দেরী হচ্ছে আজ। আশ্চর্য! লোকটা এড়াতে চাচ্ছে যেন। — কেন? জীবনে সে তো সুখী হবে!

সুধীব ফিরছে না এখনও — সন্ধ্যো কেটে গেল।

সারা সন্ধ্যে এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত কাটলো সুধীরের সেদিন চার পাঁচ বছর আগের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে। মাধুরী আর জয়ন্তীকে এড়াবার জন্যেই রিপোর্টের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়েছিল সে। তারপর রাস্তায় নিরুদ্দেশ ঘোরা। ঠেলা ভীড়। এক জায়গায় এসে মনে পড়ে যায় তার অফিসেব অবনীকে। এই মোড়টা দেখিয়ে অবনী সোৎসাহে বলেছিল সেদিন:

'সাধারণ মানুষ — পাড়ার ছেলে-ছাত্ররা তিন তিনবার লড়েছে এইখানে। ট্রাক পুড়িয়েছে — ফৌজ সমেত।'

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে উত্তেজিত জনতা। আর অবনী। অবনীর আবেগস্ফুরিত মুখটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সুধীরের চোখে — মনে পড়ে যায় তার ফুঁসে ফুঁসে ওঠা গলা, কথা, আবেগ, আশা। ক্যাসল-ব্যারাকে অসন্তুষ্ট ভারতীয় নাবিকেরা বিদ্রোহ করেছিল — তাইতে মৌজ হয়ে আছে সে এখনও। মৌজ হয়ে আছে এখনও কলকাতার রাজপথে, আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের শেকল ছেঁড়ার আবেগে, লড়াই আর প্রতিরোধে। বিস্রস্ত, এলোমেলো —মোড়ে মোড়ে। সমস্ত কিছু মিলে সে একটা অস্থির — চঞ্চল। আফশোষ হয় সুধীরের — এখন যদি তাকে তার সেই ইতিহাসখ্যাত মোড়টা দেখাতে পারতো — সেই ট্রাক আর গোরা-পোড়ানো পিচ-গলা খোয়া-ওঠা মোড়টা! সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি উৎকর্ণ জনতা রেডিও শুনছে: ক্ষমতা হস্তান্তর আর আপোস আলোচনা কতদূর এগোলো নয়া দিল্লীর দরবারে। বিস্রস্ত — এলোমেলো ভিড়। শান্ত — উৎকর্ণ। মোড়ে মোড়ে। হাওয়ায় মরা শান্তির ঘোষণা।

তারপর হঠাৎ অরুণ গুপ্তের সঙ্গে দেখা। চার বছর পরে। চেহারাটা আছে তেমনি রোগা রোগা — বরং আরও কিছুটা পাকাটে। শীর্ণ মুখে ছুঁচলো নাকটা এনে দিয়েছে আগের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণতার ভাব। মাথার চুলগুলো তেমনি অযত্নে কুঁকড়ে বিস্রস্ত হয়ে আছে। অরুণই দেখেছিল তাকে আগে। কাঁধে হাত রেখে তার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে ডেকেছিল:

'সুধীর!'

চিনতে দেরি হয়নি সুধীরের — তবে বুঝতে প্রথমটায় কষ্ট হয়। অরুণ বদলেছে কিছুটা — কেমন যেন গম্ভীর। নেই তার এলোমেলো কথার ঝড়। কথা বলে কম — কাটা কাটা। সবটায় কেমন চেপে যাওয়ার মতো ভাব — সপ্রতিভ।

'বিয়ে থা করেছ বলে মনে হচ্ছে।' বাঙালী চরিত্রের এই পরিবর্তন দেখে সুধীর যেন লক্ষ্যভেদ ক'রে বলে ফেললো, 'ছেলেপুলে কটি হে?'

'বিয়ে করিনি।'

'মানে! তোমার সেই মালতী!'—

'সে মালতী কোনোদিনই ছিল না। থাকতে পারে না বলে।'

'হেঁয়ালী রাখো। অতো চিঠিপত্র, কাব্যকাহিনী, প্রেম — সবতো প্রায় ঠিক।'—

'মালতী নামক একটি স্ত্রীলোক ছিল বটে।'

সুধীর ধরে ফেলার মতো বলে উঠলো, 'আমি সেই স্ত্রীলোকটির কথাই জিজ্ঞেস করছি হে।'

'শুনেছি কোন আই. সি. এস. ভদ্রলোকের আশ্রিত।'

'তারপর?'

'খুঁজছি।'

'সেই মালতীকে?'

অরুণ একটু হেসে কথার প্যাঁচ মেরে বললো, 'হ্যাঁ — সেই মালতীকে — যে কোনোদিন ছিল না। তবু আশা রাখি।'

'মানে?'

'শুধু বিপ্লবই তাকে জন্ম দেবে।'

'এই সেরেছে। এবার বুঝেছি তোমাব কাব্য। কিন্তু রেডিওর সামনে ভিড় দেখেছ?' সুধীর হঠাৎ একটা খোঁচা-মারা হাসি হেসে বলে উঠেছিল — যেন সামনে অবনীকেই পাওয়া গেছে: 'অতো ভিড় কেন বলো তো?'

অরুণ হেসে বললো, 'খুঁজছে — মালতীকে, অন্যভাবে। ওখানে নেই।' তারপর একটু থেমে আত্মগতভাবে বলেছিল, 'পরিপূর্ণ সুন্দর, মূর্তিমান জীবন আর প্রেম, বুঝলে সুধীর — আমি খুঁজছি। পাবো একদিন।'

কেমন ব্যক্তিগত টান আছে কথায় — মনে হয় সুধীরের। আগেই আবার মালতীর কথা হয়ে গেছে। সুধীর কথা ঘুরিয়ে বললো, 'তোমার কবিতা বড় একটা চোখে পড়ে না আজকাল। লেখা ছেড়ে দিয়েছ ?'

'না। নতুন ক'রে বরং ধরেছি এতদিনে।' অরুণ হাসলো। বললো, 'যাক — সে সব কথা। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আজ ভালই হলো। চলো আমার মেসে — সেখানে একটু কাজ সেরে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো পুরানো আড্ডায়। কিছু টাকার দরকার — মানে চাঁদা। কিন্তু পুরানো বন্ধুরা আমাকে বিশ্বাস করে না।'

'কেন ?'

'বিপ্লবে বিশ্বাস করে না বলে বোধ হয়।'

'— না তোমাকে ?'

'তাও হতে পারে।' বলে অরুণ সপ্রতিভ ভাবে হেসেছিল একটু।

'সেই পুরানো আড্ডা এখনও আছে ? সবাই আসে ?'

'কেউ কেউ ছিটকে গেছে — পাত্তা নেই শুনেছি। মাখন দত্ত, চৌধুরী, তারক — এরা এখনও ছিটকে যায়নি। আড্ডার নেতা এখন চৌধুরী।'

পুরানো আড্ডা। ডাক্তার রায়। চৌধুরী। পাচ বছর আগের বিশ্ববিদ্যালয়-ঘেঁষা জীবন। উনিশ শ' আটত্রিশ উনচল্লিশ সাল। কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে বছর বছর একেবারে চূড়ান্ত চূড়োর দিকে। সস্তা চা-খানাগুলোয় ভিড় — সস্তা চা আর সস্তা সিগারেট। তবু দুরূহ জীবন। অফিসের দরজায় দরজায় বোর্ড ঝোলানো : চাকরী নেই। নিরাপত্তাহীন দিন — ভালোবাসা — বেকারী : ছেলেমেয়েদের আত্মহত্যা। তবু স্বপ্ন ছিল, — ছিল আশা, কামনা, প্রেম। অরুণের প্রেম। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরের আলো-ছায়ার রহস্যময়তায়, ভারতীয় সংস্কৃতির ফ্রেসকো আঁকা লাইব্রেরিতে অসংখ্য ছেলেমেয়ের মুখ অনির্দিষ্ট ভাবীকালের ধ্যানে লুব্ধ। আড্ডার

বন্ধুরা কে কোন বিষয় নিয়ে কে কোন বিভাগে ছিটকে ছিল — বি. এ-তে ভালো ভাবে পাশ ক'রে এসেছিল সবাই। চৌধুরী সকলকে গেঁথে তুললো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই বিষয়ের পর বিষয় বদলে চললো সে। একটা বিষয় তার সাত দিনের বেশি টিকতো না। কোনো সাত দিন ইংরেজি, কোন সাত দিন অর্থনীতি — মায় বাংলা, চারুকলা পর্যন্ত। ঘুরে ঘুরে ভালো ছেলের খোঁজ করতো। তারপর আলাপ করে বলতো: 'অসম্ভব — ওর সঙ্গে কমপিট করতে পারবো না।' কমপিট করা হলো না কিন্তু বন্ধুত্ব হয়ে গেল অনেকের সঙ্গে। জমে উঠলো আড্ডা। জীবনপ্রাচুর্যে ভরা কয়েকজনা — মার্কামারা ভালো ছেলে, বর্তমান সমস্ত কিছু ব্যবস্থার ঘোরতর অবিশ্বাসী, আস্থাহীন। পুরাতন নির্জীব শান্ত বাঙালী ছাত্রের জীবনে মূর্তিমান বিদ্রোহ। তারপর ডাক্তার রায়ের আড্ডা — রেস কোর্স — নাইট-ক্লাব। পুরাতন খবরের কাগজের মতো হলদে হলদে অধ্যাপকরা সভয়ে বলতো ফিস ফিস করে: 'ছোটলোক! সব নষ্ট হয়ে গেল!'

গেল। যেন ঝড়ে উড়ে গেল — বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত-ধ্যানে সমাধিস্থ গম্ভীর স্তব্ধ পাঁচিল ভেঙে। হোস্টেলে এসে উঠলো একে একে। বাড়ী ছাড়া — বাধাবন্ধনহীন, বেপরোয়া।

সন্ধ্যের পরে আড্ডা জমতো ডাক্তার রায়ের কোণের ঘরে। তিনখানি ঘর নিয়ে ছিল ডাক্তার রায়ের চেম্বার। তার ডাক্তারি বলতে ছিল সামান্য কয়েকটা শিশি-বোতল আর বাইরে একখানা নামের ফলক লাগানো। আর তিনখানি খুপরিতে তিনটি বেড। সে বেডে রুগী শোয়নি কোনো-দিন। আসতো জোড়ায় জোড়ায় ছেলে মেয়ে। ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করতো বেড। বাইরের বসবার ঘরে ভিড় হত এ্যাংলো বা বাঙালী নার্সের, দরিদ্র গেরস্ত বাড়ীর আনকোরা বিধবা বা বিভ্রান্ত কুমারীদের। চলতো মেয়ে-চালানী কারবার। আসতো ডাক্তার, অধ্যাপক, ছাত্র। আর

আসতো কোনো কোনো ছুটির দিনে যুক্ত প্রদেশের পঞ্চাশোত্তীর্ণ স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক — সঙ্গে প্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে। বিছানা ভাড়া নিতো কয়েক ঘণ্টার জন্যে। লোকটি ছিল কোন এক কারখানার মালিক।

এই যুগলটির রহস্য ফাঁস করেছিল একদিন ডাক্তার রায়। বলেছিল, 'ওরা কিন্তু স্বামী-স্ত্রী।'

'তবে এখানে আসে কেন?' অরুণ জিজ্ঞেস ক'রেছিল। 'এ জায়গায় যাঁর তো শুধু আমরা।'

'মাঝে মাঝে এখানে আসতে ভালো লাগে নাকি। এই একটু এক-ঘেয়েমী কাটানো আর কি। ওঁর স্ত্রীর তাগিদেই নাকি আসতে হয় ভদ্রলোককে।' অরুণকে কাব্য ক'রে বলেছিল ডাক্তার, 'এই একটু বাঁধন-ছেঁড়ার ফুর্তি আর কি।'

সেই আড্ডা।

'সে আড্ডা আছে এখনও তা হলে?'

'আছে — তবে সেখানে নেই। চৌধুরী রেস্তোরাঁ-বার খুলেছে একটা — সেইখানে সবাই যায়। চৌধুরী এখন মস্ত লোক।'

'সেই আইরিন — চৌধুরীর সেই এ্যাংলো মেয়েটি?'

'আইরিন চৌধুরী বলো। চৌধুরী তাকে বিয়ে করেছিল।'

'গুড।'

হঠাৎ চৌধুরী একদিন কোন নাইট ক্লাব থেকে ফেরবার পথে মত্ত অবস্থায় ট্রাম থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙলো। হাসপাতালে না গিয়ে অরুণ তাকে সোজা এনে তুললো ডাঃ রায়ের চেম্বারে।

ডাঃ রায় মুখ শুকনো করে বলেছিল, 'শেষে এখানেই আনলেন! বিপদের ঝুঁকি—'

চৌধুরী বলেছিল, 'বেডের জন্যে ভয় নেই — টাকা পাবেন। হাসপাতালে আমার বমি আসে। ভালো ডাক্তার ডেকে যা যা করবার

করুন। এ-ঘর আমি ছাড়ছি নে। বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে অরুণ।'

বাড়ীর অবস্থা ভালো চৌধুরীর — বাবা ছিল তার কয়েকটা সায়েব কোম্পানীর এজেন্ট।

ডাঃ রায় বলেছিল, 'তা করছি — ভালো ডাক্তার এবং নার্স—'

'আপনার ভালো মানে তো ওই যত পচা ঘেয়ো নার্স। আমার এমন নার্স চাই — যারা আগে কখনো আসেনি এখানে। বুঝলেন?' চৌধুরীর চোখে মুখে চাপা ইঙ্গিত।

ডাক্তার মাথা চুলকে বলেছিল, 'তা আছে। তবে, মানে এ জায়গাটা ওদের মধ্যে বড্ড পরিচিত। যারা আসতে চায় না তাদের আনা শক্ত।'

তারপর এলো আইরিন। সবে পাশ ক'রে বেরোনো। ওর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে নিরীহতার সুস্পষ্ট ছাপ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চৌধুরীর মাথার কাছে বসে গল্প করতো। খোলা মনে বলতো তার বাড়ীর কথা — পরিবারের দারিদ্র্য, বাপের মাতলামী, বিবাহিত দিদি একটির দুঃখ — তার স্বামীর পীড়ন, অনাচার আর তার চার পাশের ইতরতা। বলতো — তার ভালো লাগে না। বলতো হিন্দুদের পারিবারিক জীবন সে তুলনায় অনেক লোভনীয়।

দ্বিতীয় দিনে একটু গায়ের ব্যথা সেরে উঠতেই চৌধুরী হাত চেপে ধরেছিল আইরিনের — বাঁ পায়ে তখনও তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'ছাড়, ছাড় চৌধুরী— তুমি এখনও অসুস্থ।'

চৌধুরীর শক্ত মুঠো টেনে এনে ফেলেছিল আইরিনকে বিছানায়।

'তুমি অসুস্থ — চৌধুরী— ছাড়ো দোহাই তোমার!'

মেয়েটা শেষ পর্যন্ত নাকি মুখে হাত ঢাকা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেছিল চৌধুরীকে:

'আমাকে খারাপ ভেবো না তুমি। ছেড়ে দাও চৌধুরী — দয়া করে ছেড়ে দাও আমাকে। ঈশ্বরের দোহাই। তুমি যা ভাবছো আমি তা নই।'

এর কয়েকদিন পরেই সুধীরকে বলেছিল সে: তার নিজের সমাজে কোথাও সুস্থ আশ্বাস নেই তার — আছে শুধু ঘৃণা, ভয়। আর চৌধুরী,— চৌধুরী একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ার।

তবু, তার আপন সমাজ থেকে ছিটকে আসা এই মেয়েটির একমাত্র পুরুষ বন্ধু ছিল চৌধুরী। আসতো যেতো — ঘুরতো পেছনে পেছনে। কয়েক মাস পরে জানা গেল — সে সন্তানসম্ভবা। এই পর্যন্তই জানে সুধীর।

'তারপর আরও দু-দু'বার তার ওই অবস্থা হয়েছিল।' অরুণ বললে, 'কিন্তু তৃতীয় বারে চৌধুরী হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললো — ওকেই বিয়ে করবে। বললো — শরীর বেশ ভেঙে পড়েছে ওব, দু-দু'বারের জখম। তা ছাড়া ও ছেলে চায় — কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বিয়ে ওকেই করবো — বাঙালী মেয়েতে আমার বমি আসে।'

'মায়া হঠাৎ উথলে উঠলো ?'

'আমার তা মনে হয় না।' হেসে বললো অরুণ, 'একটা ঈর্ষার ব্যাপাব আছে — কিছুটা সন্দেহও হতে পারে। আসলে মার্কিন অভিযান।'

যুদ্ধ। কলকাতা শহর ছেয়ে গেছে তখন মার্কিন ফৌজে। পুরো দুটো বছর বসে রইলো তারা এখানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় — কলকাতা থেকে যুদ্ধ তখন অনেক দূরে। তাই প্রচুর মদ খেল তারা — রেস্তোরাঁগুলো হয়ে গেল সব মদের আড্ডা। বৃটিশ অফিসারদের যেন বেত খাওয়া মুখের ওপরে বেপরোয়া টাকা ওড়ালো তারা — ফুর্তি করলো। নারী-বুভুক্ষু গোটা বাহিনীটার ধাক্কা গিয়ে পড়লো প্রথম এ্যাংলো সমাজের ওপর — তারপর খাস ইংরেজ পরিবার। তবু কুলোয় না। শেষ পর্যন্ত এঁদো গলির দিশী পতিতালয় পর্যন্ত।

অরুণ বললো, 'প্রথম ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই চৌধুরী কিন্তু বিয়ে করেছে — তাই আমার সন্দেহ।'

'বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ?'

'এর আগেই বা ছিল কি ?'

কিছুই ছিল না। বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী মন দিয়েছিল ব্যবসায়ে। তার এতদিনকার অন্তরঙ্গ নাইট ক্লাবগুলোর মদ সরবরাহের কনট্রাক্ট জোগাড় করে ফেলেছিল ঘুরে ঘুরে। তারই মধ্যে নিজের ব্যবসাও ফেঁদেছিল সে একটা ছোটখাটো। যুদ্ধের বাজারে — বিশেষ করে বিয়াল্লিশ থেকে, কলকাতায় যখন এককোঁটা হুইস্কির জন্যে হাহাকার পড়ে গেছে, তখন টাকা লুটলো সে দু-হাতে।

'পাকা ব্যবসায়ী।' অরুণ বলে, 'আইরিনকে নিয়ে ঘর সংসারও পেতেছিল — হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন। একেবারে পাকা গিন্নির মতো আইরিন সামলে নিয়েছিল ওই দুরন্ত জানোয়ারকে। বেচারী আইরিন।'—

তারপর থেমে যায় অরুণ। কিন্তু মন থামে না তার। পাশাপাশি হেঁটে চলে ওরা। অরুণের মনে মনে ঘোরে আইরিনের সংসার পাতার কাহিনী। চোখ-বসা রোগা টিকটিকে মেয়েটা — গাউনের ভেতর থেকে পেটটা উঁচু হয়ে উঠেছে বিশ্রীভাবে। কুৎসিত লাগতো অরুণের — গর্ভিনী মেয়েদের দিকে যেন তাকানো যায় না। এড়িয়ে চলতো সে। আইরিন বলেছিল একদিন হঠাৎ :

'তুমি এড়িয়ে চলো আমাকে কবি — বুঝতে পারি। আমাকে খুব খারাপ ভাবো তোমরা — না ?'

'না — তা কেন ?'

'আমাদের জাতটাকে তোমরা তাই ভাবো। লুকিয়ে লাভ কি।' তারপর একটু থেমে বলেছিল বিষণ্ণ গলায়, 'খারাপ কাজ হয়তো করেছি — কিন্তু সে তোমার ওই বন্ধুর খেয়াল মতো।'

'ওসব কথা আমি মোটেই ভাবি না আইরিন। বরং তোমাদের বিয়েতে সত্যিই আমি খুশি। বিশ্বাস করো। তোমাদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা যে আমার ছিল না তা নয় — তবে এখন ভুল ভেঙেছে।'

'সত্যি বলছো কবি?' অরুণের হাত চেপে ধরেছিল আইরিন — চোখে স্নিগ্ধ ঘনিষ্ঠতা। বলেছিল, 'প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানো তোমার সম্বন্ধে?— ভালো বন্ধু হতে পারবে তুমি। বিশ্বাস করো। আচ্ছা কবি, তোমার কোনো বোন নেই?'

'না। কেন?'

'কোনো মেয়ে বন্ধু?'

'কেন বল তো?'

'থাকলে বেশ হত — আলাপ করতুম।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সলজ্জে বলেছিল, 'শাড়ী পরাটা শিখতুম — শিখতুম তোমাদের বাংলা ভাষা। চৌধুরী সেদিন গুন গুন ক'রে টেগোরের গান গাইছিল একটা — পরে আমাকে ইংরেজি ক'রে বললো তার মানে। এত সুন্দর! আমাকে শেখাবে একটু বাংলা?'

আরও একদিন বলেছিল, 'তোমার তো কোনো মেয়ে বন্ধু নেই কবি — ভালো লাগে তোমার? তুমি আলাপ করো আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে। তোমার কথা বলেছি তাকে — আলাপ করলে সে ভারি খুশি হবে।'

অরুণ হেসে বলেছিল, 'তোমার মতলব ভালো নয় আইরিন।'

আইরিন বলেছিল, 'হয়তো নয়। তবে আমার বন্ধুটি হয়তো সুখী হতে পারতো।' তারপর একটু উত্তেজিত হয়েই যেন বলেছিল, 'বিয়ে যদি হয় তার — হবে একটা মাতাল পুলিস সার্জেন্ট, রেলের ড্রাইভার বা বাজে কোনো একটা লোকের সঙ্গে। শান্তি পাবে না জীবনে। হিন্দুরা ভালো স্বামী হতে পারে। কিন্তু, যারা আমাদের সঙ্গে মিশতে যায় তারা যায় সয়তানির মতলব নিয়ে। তারা যদি জানতো' — বলে উত্তেজনায় থেমে গেছে আইরিন।

বিষণ্ণ চোখে শূন্যে চেয়ে চেয়ে নিজের মনের গোপন কথাগুলি এমনি বহুদিন বলেছে আইরিন। চৌধুরী সম্বন্ধে বলতো, 'ওকে আর কিছুদিনের মধ্যেই দেখো — ভদ্রলোক ক'রে তুলবো।'

অনেক দিনের অনেক কথা একে একে মনে পড়ে যায় আজ বহুদিন পরে। তার লুকিয়ে সিঁদুর পরা আর শাড়ী পরার সাধনা, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক — তার সুন্দর একটি বাঙলা নাম রাখার অনুরোধ — এমনি কত কি। তার বাপ ছিল একটা মাতাল ফরাসী, মা এদেশের দু-পুরুষের ভারতীয় ওলন্দাজ — রক্তে ওর বিদেশী ধারা। তবু কেমন বাঙালী মেয়ের মতো ভাবালু, — অথবা হয়তো প্রত্যাশা-মেদুর উনিশ বছরের কোনো আলাদা জাত নেই, দেশ নেই!

পথ চলতে চলতে অরুণ হঠাৎ অন্যমনে বলে উঠলো, 'আইরিন মারা গেছে ছেলে হতে গিয়ে।'

সুধীর যেন তার কথার প্রতিধ্বনি করেই বললো, 'মারা গেছে আইরিন?'

অরুণ আর কোনো জবাব দেয় না। হয়তো জবাব দেওয়ার নেই কোনো। মুখ নিচু ক'রে সে পথ হাঁটে। পেছনে সুধীর। আইরিনের মুখটা ঠিক মনে পড়ছে না সুধীরের — তবু যেন অতি পরিচিত মনে পড়ছে কিছু কিছু — কিছু ভালো, কিছু মন্দ, কিছু ব্যর্থতা।

বিয়াল্লিশ সাল। তারপর চার বছর কেটে গেছে কোন দিক দিয়ে। অরুণের সঙ্গেও তার শেষ দেখা সেই বিয়াল্লিশে — জাপানী বোমা পড়ছে তখন কলকাতায়, জনসংখ্যার চাপ কমে গেছে শহর থেকে। ছেলে মেয়ে, ছাত্র, ফালতু লোক কমে গেছে সব। শহরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা — সস্তা আর বেকার। নিরুদ্দেশ ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুর বেলা গিয়ে পড়েছিল সে ডাক্তার রায়ের আড্ডায়। আড্ডায় মিলিত হওয়ার সময় সেটা ছিল না, তবু গিয়ে পড়েছিল সে। গিয়ে দেখেছিল — তারও আগে সেই কোণের ঘরটায় ছোট পেগ-টেবল একটা ঘিরে বসে আছে চৌধুরী, অরুণ,

মাখন দত্ত, তারক। ঘোড়া মার্কা বোতল একটা গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝের ওপর। টেবলের গেলাসগুলি সব খালি।

'কি ব্যাপার হে! বেঁচে আছো তো সব?'

'আছি — কিন্তু পয়সা নেই।' বলে চৌধুরী মেঝেতে গড়ানো বোতলটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

মাখন দত্ত ধমকে উঠেছিল, 'চেঁচিও না — উড়ে যাবে।'

মাখন মাছি মারছে — শাণিত দৃষ্টি তার তখন টেবলের ওপরে। একটা মাছি — বেট পাঁচ টাকা। হলো না। মাছিটা উড়ে গিয়ে বসলো তারকের মুখে। তারক অত্যন্ত সন্তর্পণে হাত তোলে।

জুয়া ধরেছে মাছিটার ওপরে। মাছিটাও উড়ে উড়ে বসছে এর মুখ থেকে ওর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে।

মহাযুদ্ধ। জাপানী বোমা। আর সেই করুণ বিয়াল্লিশ সাল। নেকটাই আর ট্রাউজার ছেঁড়া-কাড়ার হৈ-হল্লা, মিলিটারী ট্রাকের ওপর ঢিল ছোঁড়া, ব্যারিকেড আর জাপানী আশ্বাস — সব চাপা পড়ে যায় কোথায় জাপানী বোমার ঘায়ে।

নেতারা জেলে। সস্তা — ফাঁকা — বেকার রাজধানী কলকাতা। মনে পড়ছে — বহুদিন পরে অরুণকে দেখে আবার মনে পড়ছে সব। হেঁটে চলেছে ওরা দু-জন নিঃশব্দে। এক জায়গায় গলিতে বাঁক ফিরেই অরুণ বললো, 'এই মেস — এসো।'

'বিয়াল্লিশ সালেই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা — তাই না?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুধীর বললো।

'তোমার খবর আমি রাখতুম তবু।' অরুণ বললো। ঘরে ঢুকলো।

আগের মতোই এলোমেলো ঘর তার। বিছানার দু-পাশে এলোমেলো বই খাতা পত্র। ঘরে আরও তিনটি সীট। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে পশ্চিমের একটা জানালার কাছে গিয়ে আটকে গেল সুধীর। ওপাশে একতলা

দোতলায় মেশামেশি ছাদ — অধিকাংশই একতলা। নিচু নিচু পুরানো বাড়ী। ছাদের ওপরে দরমার দেওয়াল আর হোগলার ছাউনী দিয়ে ছোট ছোট খুপরী করা।

'ঘরগুলোকে তো ভালো মনে হচ্ছে না হে অরুণ?'

'ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন — তেতাল্লিশ সাল।' অরুণ বললো, 'যে তিরিশ হাজার গেরস্থ ঘরের যুবতী মেয়ে পতিতালয়ে এসে নতুন ঢুকলো শ্রেফ পেটের দায়ে — তারা যায় কোথায় বলো? রাজধানীতে অত ঘরও নেই।'

'হুঁ।' ব'লে সুধীর হাসলো, 'পাড়াটা তোমার তোফা কবি। এসেই সেকালের কবি নবকৃষ্ণের কবিতা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে :

ঘরে ঘরে রূপের হাট
বাঁধা হুঁকো তাকিয়া খাট
খেমটা নাচে পান্নাবাঈ।'

সরু অন্ধকার গলি একটা চলে গেছে নিচু একতলা বাড়ীগুলো ভেদ ক'রে। রাস্তায় বিজলী আলো নেই — গ্যাসের বাতি, মরা মরা আলো। তারই মাঝখানে আলো অন্ধকারে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এক পাল মেয়ে একটা প্যাসেজের মুখে : মুখে মাখা কড়া রং, কিছুটা সস্তা রঙীন শাড়ীর জেল্লা। সেকালের হাটও নেই, আভিজাত্যও নেই।

সেই দিকে তাকিয়ে সুধীর বললো, 'তুমি আবার বিপ্লবে বিশ্বাস করো।'

'হ্যাঁ, মানুষকে এখন বিশ্বাস করি।' অন্যমনে একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল অরুণ। চিঠি লিখছে সে। লিখতে লিখতেই জবাব দিল।

'আমার হাসি পায়।' সুধীর বললো।

অরুণ তেমনি ভাবে জবাব দিল, 'এক ধরনের হাসি আছে — যাকে বলে কান্নার নামান্তর।'

সুধীর আর কোনো কথা বলে না।

খান ছুয়েক চিঠি লেখা শেষ ক'রে অরুণ বললো, 'চলো এবার যাই। আড্ডায় সবাই এসে গেছে বোধ হয় এতক্ষণে।'

মেস থেকে বেরুলো ওরা দু-জনে। পাশাপাশি হেঁটে চললো এসপ্ল্যানেড মুখো। কেউ আর কোনো কথা বলে না। সামনে আর পিছনে ভিড়ের চাপ — অসংখ্য মানুষেব আনা-গোনা। যুদ্ধের শেষ দু'বছর থেকে হঠাৎ ভিড় বেড়ে গেছে কলকাতার। ভারতের পুর্ব সীমান্তের প্রাণকেন্দ্রে মহাযুদ্ধ ডেকে এনেছে মানুষকে তাব রথের রশি টানবার জন্যে। রথ চলে গেছে — মানুষগুলো পড়ে আছে। ছুটছে জীবন-সংগ্রামের নতুন ধাক্কায়। সামরিক প্রয়োজনের অফিসগুলো উঠি উঠি ক'রে ওঠেনি তখনও। বন্ধ হয়নি তার কারবার কারচুপি ভীড়। ময়না তদন্তের ফেরৎ মড়ার গায়ে অসংখ্য মাছি যেন ছেঁকে ধরেছে। ট্রাম, বাস — অসংখ্য মানুষের টুকরো টুকরো কথা, হাসি, কান্না, ব্যবসা, গালাগালি — সব মিলে একটা মহাগুঞ্জনের চাপ। রাস্তাব ধারের আলোগুলোব ঠুলি আর নেই — আলো-আঁধারিতে মেশানো নেই ভুতুড়ে ভুতুড়ে ভাব। তবু আলো কম — হঠাৎ মনে হবে, কোথায় একটা ফাঁক থেকে গেছে। আলো কম। সো-কেসওয়ালা দোকানগুলোর বিমান-আক্রমণ ঠেকানো দেওয়াল তখনও ভাঙেনি। ভাঙছে। মহানগবীর আকাশে ছিটকে যাওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া মরা আলোর মহাপিণ্ডটার মাঝখানে অসংখ্য মানুষের মহাগুঞ্জন গড়াতে গড়াতে উঠে যাচ্ছে আবও উঁচুতে। চাঁদ আর তাবা আঁকা আকাশের তলায় নিববচ্ছিন্ন একটা শব্দ : ভন্ ভন্ — ভন্ ভন্।

এর মাঝখানে ফাঁকা কতকগুলো দিন ফাঁকা থেকে যায় তবু — নীতিহীন, আশা-আশ্বাসহীন, ভ্রষ্ট। অসংখ্য মুখ — অসংখ্য দিন একটা বিরাট আর ব্যর্থ শূন্যতা রচনা করে সুধীরের মনের মাঝখানে। কি তার গুরুভার চাপ! সে ভগবানে বিশ্বাস করলে বলতো ককিয়ে ককিয়ে দম চেপে চেপে : তুমিই আমার ভগবান — ভাগ্যবিধাতা। তোমাকে দেখলাম — চিনলাম।

কিন্তু বলে উঠলো সে আর এক কথা। বললো, 'বাসুদেব আত্মহত্যা ক'রেছে জানো ?'

'জানি।' অরুণ ছোট্ট ক'রে জবাব দিল, 'একটা গাধা — অন্ধ।'

সুধীর বললো, 'মতে মিলছে না। বরং গাধাটিকে আমার মনে হচ্ছে একটি বাস্তবিকই পণ্ডিত ইস্কুল মাস্টার — চক্ষুষ্মান। দেখলো সব — বুঝলো সব। বাপের এণ্ডিগেণ্ডি গুচ্ছের — অচল সংসার, একটা ধাড়ী বোনের জান্তব দাবী, তারপর তার সেই দশ-শালা প্রেম — গোরুর গাড়ীর মতো চলছে তো চলছেই, শেষ নেই — পথ নেই। সবগুলো নিয়ে বেসামাল হ'য়ে পড়েছিল বেচারী। বরং বুদ্ধিমানের মতো আত্মহত্যা ক'রে সামলে নিয়েছে।'

অরুণ কোনো জবাব দিল না।

তারপর আবার চুপ ক'রে হেঁটে চললো দুজনে। হঠাৎ যেন সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেছে। বাসুদেবই শেষ, যেন চরম ঘটনা - পুরানো দিনগুলো সম্বন্ধে আর কিছু জানবার নেই। জানাবারও নেই। নীরবে পথ চলছে ওরা — পথ চলছে অসংখ্য মানুষ — সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে : চলো — চলো।

এক জায়গায় এসে অরুণ বললো, 'ঢোকো — এইখানে।'

এসপ্ল্যানেডের একটি বারে ঢুকলো ওরা। ভেতরে ঘুমে ঢলা আলো — ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নার মতো, চোখ শিব শিব ক'রে ওঠে। কাচ আর কাঁটা-চামচের মিঠে আওয়াজ। ঠাণ্ডা। নিঃশব্দতার চারু আমেজ। দু-পাশের দেওয়াল ঘেঁষে কেবিনের সারি। মাঝখানের হলে সাজানো টেবিল চেয়ার সবগুলিই প্রায় খালি। ঢোকার মুখে সামনের টেবিলে একা বসেছিল একজন। বুড়ো মতো, মাথা ভর্তি টাক। বয়সের জীর্ণতায় গাল দুটো বসা। দাঁত নেই — ঠোঁট দুটো কুঁচকে ঢুকে গেছে মুখের ভেতরে। সারা মুখের মধ্যে শুধু নাকটাই চোখে পড়ে তার — গণ্ডারের খড়্গের মতো উঁচু

হয়ে আছে। বসা চোখ, বসা মুখ — বিষণ্ণ। এদের দু-জনকে দেখে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার শুঁটকো মুখ। দু-হাতে আঙুল গুলোকে বন্দুক ছোঁড়ার মতো তাক করলো সে দু-জনের দিকে। মুখে শব্দ করলো সে দু-বার :—
'পট্ পট্— ই ··· য়া, নাইনটিন।'

অরুণ যেতে যেতে পেছন ফিরে হেসে বললো, 'মাত্র উনিশটা হলো আজ জনি ?'

বুড়ো জনি ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললো, 'ইয়েস। আরও এক ঝাঁক আশা করছি।'

'কে ?' সুধীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'জনি ওর নাম।' অরুণ ছোট্ট করে তার পরিচয় দিল, 'অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজাতো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে — রাইফেলে এখন এরোপ্লেন নামায রোজ এখানে এসে। তিন ছেলে মরেছে যুদ্ধে - পাইলট ছিল।'

কেবিনের সারি থেকে দূরে — হলের এক বিচ্ছিন্ন নিষ্প্রভ কোণের এক টেবিল থেকে হৈ-হৈ ক'রে উঠেছে চৌধুরী ওদের দেখে :

'এসো দলত্যাগী, বসো বসো।'

চেয়ার টেনে বসলো দু-জন।

চৌধুরী বললো, 'ইস্— কতদিন পরে হে !'

বহুদিন দল ছাড়া সুধীর। হঠাৎ কেমন বেখাপপা লাগে। তাকে নিয়েই পড়ে সকলে।

'তারক — তারক কি করছো এখন ?' সুধীর জিজ্ঞেস করলো।

শাণিত গলায় উত্তর দিল চৌধুরী, 'বছর চারেক ধরে একটা গুরুতর কিছু লেখবার মতলব আঁটছে ও।'

তারক চোখে চোখ রাখলো সুধীরের, তারপর অরুণের। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বললো, 'কিছু না। সমালোচনা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।'

বলে সামনের শূন্য কাঁচের গেলাস একটা অত্যন্ত অধৈর্যের সঙ্গে শূন্যে তুলে ধরে আবার টেবিলের ওপর রেখে দিল — দূরে সরিয়ে। যেন সব কিছুকে সে এমনি দূরে সরিয়ে দিলে।

'আর মাখন ?' সুধীর জিজ্ঞেস করলো।

মাখন বললো, 'তারকের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কিছুই হতে পারে না — সমালোচনাতেও না। আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি।'

সুধীর শাণিত গলায় বললো, 'তা হলে গত চার বছর ধরে তোমরা এই করছো ?'

মাখন আবার বললো, 'হ্যাঁ, আমি ভালো করে ভেবে দেখেছি।'

আস্তে আস্তে একটি একটি করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে মাখন কথাগুলি। এতটুকু জড়তা নেই। বক্তব্য সম্বন্ধে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই যেন। তারপব একেবাবে চুপ কবে গেল সে এক কোণের নিষ্প্রভতায়। অরুণেব মুখে নিঃশব্দ চাপা হাসি। তাবক যেন মাখনের ছুঁড়ে মারা কথা গুলোয় হঠাৎ ভয়ানক দমে গিয়ে তাকায় ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে। চৌধুরীর শাণিত ধূর্ত মুখে কেমন একটা বেয়াড়া বাঁকা ঝিলিক। সবাই চুপ কবে আছে। হলভবা ধুম-ধুম মবা আলো। কাঁচ আর কাঁটা-চামচের মৃদু শব্দ। কেবিনের ভেতর থেকে ছিটকে আসা পরিতৃপ্তির জান্তব দু-একটি শব্দ — অস্পষ্ট, বিলীয়মান।

হঠাৎ কেমন যেন থিতিয়ে যাওয়া আবহাওয়া। শুধু সুধীর উৎসাহ ভরে ঝাঁকানি দেয় মাখনের কাঁধে। বললো, 'গুড্।' তাবপর অরুণকে দেখিয়ে বললো, 'এই লোকটা শুধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অন্য কিছু একটা। দেখ ওর হাসি — একটা অবজ্ঞার মতো।'

মাখন তেমনি স্থির মৃদু গলায় বললো, 'জানিনে ওর কথা।'

'হ্যাঁ, চুলোয় যাক ও।' সুধীর হেসে বললো, 'তারপর তোমার সেই এক্সপেরিমেন্টের কত দূর বলো।'

মাখন মরা খাওয়া গলায় উত্তর দিল, 'যেমন করে চেয়েছিলাম তা আর হলো কই ?'

রসায়নের ছাত্র মাখন — মাথায় ছিল তার এক কাঁড়ি পরিকল্পনা, নতুন সন্ধান। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে সব ছেড়ে ছুঁড়ে চাকরী খুঁজতে শুরু ক'রেছিল। তারপর হঠাৎ দাঁও লেগে গেল যুদ্ধের মাঝামাঝি। ভারত মহাসাগরে তখন চলছে জাহাজ-ডুবি — বিদেশের রফতানী বন্ধ। এমন সময় তার পরিকল্পনা আর গুজরাটি এক মহাজনের টাকায় জোড় লেগে গেল।

মাখন অত্যন্ত সকরুণ ভাবে বললো, 'কিন্তু লোকটা শুধু ব্যবসাই বোঝে, আর কিছু না। আমি চেয়েছিলাম' — বলে ফুসফুসে বেশ খানিকটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে যেন অনেকগুলো বড় বড় কথা বলতে যায় সে। তারপর হঠাৎ থেমে যায়। হঠাৎ কুঁকড়ে যায় একটা ফুটো বেলুনের মতো।

মাখনের শেষ না-করা কথাটাকে তারক শেষ করে দিল। কথায় তার খোঁচা মারার ভাব। তারক বললো, 'মাখনের পরিকল্পিত ফার্মে মাখন এখন চাকরী করে।' তারক কথা বলে কেমন বাঁকা ভাবে। অর্থাৎ সমালোচনা দরকার। সমালোচনা ছাড়া কিছুই হতে পাবে না এবং মাখনের ব্যাপারটা যেন তারই জলন্ত প্রমাণ।

চৌধুরী তীক্ষ্ণভাবে হেসে উঠলো।

অরুণ মাখনের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'তবু ও এই হতভাগ্যদের মধ্যে ভাগ্যবান। বিয়ে-থা ক'রে ঘর সংসার করছে, চাকরী করছে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে।'

মাখনকে আরও বিবর্ণ দেখায় সহসা।

তারক তার সমালোচনার ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবের সমর্থনে মরিয়া হয়ে বলে উঠলো, 'তুমি জানো না। ওর বৌ চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের পর আর চাকরী করতে সে রাজী নয়।'

সুধীর বলে উঠলো যেন হাঁফ ছেড়ে, 'ঠিক করেছেন — ভারতীয় নারীত্বের পুর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।'

তারক আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, 'হচ্ছে না — কিছুই হচ্ছে না। তাই তো বলি, সমালোচনার দরকার।'

আলোচনার ধারা মাখনকে কেন্দ্র ক'রেই চলে। মাখনকে আড়ষ্ট দেখায় কেমন। মার খাওয়া, কোণ খোঁজা, হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়া একটা মানুষ। তারকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার বিগত চার বছরের সুচিন্তিত বক্তব্যের সমর্থনে এলোপাথাড়ি সমস্ত যুক্তিকে সে একত্রিত ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে মাখনের মুখের ওপরে : সমালোচনার দরকার।

মাখন অনড়। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে শুধু। হতে পারে না — কিছুই হতে পারে না।

সন্ধ্যে অতিক্রান্ত হলো। চৌধুরীকে কেমন যেন চঞ্চল দেখায়। ভিড় বাড়ছে ধীরে ধীরে। হলের চেয়ার-টেবিলগুলি ভরে গেছে প্রায়, কেবিনগুলিও। সুধীরের উপরওয়ালা হরিশ দত্ত কখন এসে জাকিয়ে বসেছে মাঝখানের বড় টেব্‌লে। সাঙ্গপাঙ্গ জনা দুই বড ব্যবসায়ী, দৈনিকের একজন সম্পাদক, লেখক একটি। সুধীর চেনে সকলকে।

ভিড় বাড়ছে। রাত বাড়ছে। নেশা বাড়ছে। কথা বাড়ছে। মৃদু আর চাপা কলকণ্ঠ জড়িয়ে জড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে হলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ঠাণ্ডা, মোলায়েম, ঢলানো ঢালানো কথা।

একটি ছিপছিপে মেয়ে এগিয়ে আসছে চৌধুরীদের নিষ্প্রভ কোণটাকে লক্ষ্য ক'রে। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ মুখ — চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। ছিপছিপে দেহ ঘিরে পেঁচিয়ে উঠেছে জরির কাজ করা লাল-পাড় শাদা সিল্কের শাড়ী, ঋজু চলার ভঙ্গী। সবটা মিলে করে তুলেছে তাকে খাপখোলা ঝকমকে তলোয়ারের মতো।

চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। অরুণ আর সুধীরের দিকে চেয়ে

বললো, 'তাইতো হে — এমন দিনে এলে যে লম্বা একটা আড্ডা দেওয়া গেল না।' ঘড়ি দেখে বললো, 'বেরিয়ে যাবো একটু। বসো — আসছি।' বলে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। তাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো গিয়ে একটা কোণ-ঘেঁষা কেবিনের ভেতরে।

অরুণ হতাশ হয়ে বলে উঠলো, 'তাইতো — আমাব কিছু কথা ছিল যে !'—

তারক অলস আমেজি গলায় বললে, 'ঘাবড়িও না। চৌধুরী ওকে বসিয়ে রাখবে — আর মাঝে মাঝে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে আসবে। মেয়েটির ধৈর্যের সীমা নেই।'

'কে উনি ?'

'চৌধুরীর নবতম বান্ধবী — এক স্টিল মার্চেন্টের দ্বিতীয় পক্ষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবে ও ওইখেনে। দেখ।'

আর খাবে এটা ওটা সেটা — ইস্পাত ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় পক্ষ। ক্রমাগত টুকিটাকি খেয়ে চলবে যতক্ষণ না চৌধুরী ওকে নিয়ে বেরুবে, গিয়ে ঢোকাবে তার গুহায়। একা থাকে চৌধুরী ফ্ল্যাট নিয়ে — সাহেব পাড়া ঘেঁষে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড বেধে যায় জনির টেবলে। সকলের চোখ গিয়ে পড়ে সেই দিকে। জনি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে — চোখ মুছছে একটা ময়লা রুমাল বের ক'রে — নাক ঝাড়ছে বার বার। আর তাকে রুখে দাঁড়িয়েছে একটি বিদেশী নাবিক। ঢিলে ঢালা পোশাক, ট্রাউজার ঝুলে পড়েছে কোমরের নিচে। হাতের আস্তিন গুটোনো। চওড়া পিঠ — চওড়া কাঁধ। ছোট ঘাড়। রুখে দাঁড়ানোয় পেছন থেকে মনে হচ্ছে গরিলাব মতো। ওদের লক্ষ্য ক'রে যথারীতি রাইফেল চালিয়েছিল জনি — নাবিকটি তার ভালুকের মতো থাবা দিয়ে জনির মাথায় সোজা বসিয়ে দিয়েছে একটা থাবড়া। তার পাশে আরও গুটিচারেক নাবিক — তেমনি ঢিলেঢালা

পোশাক। জনি কাঁদছে। শুকনো বুড়োটে মুখটা আরও কুৎসিত হয়ে উঠেছে পেশীর আকুঞ্চনে।

কেবিনের ভেতর থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে সবটা একবার আন্দাজ ক'রে নিল যেন চৌধুরী। তারপর বললো অস্ফুট কণ্ঠে, 'সেরেছে — সোয়াইনগুলো এসে গেছে আজ।'

ওরা এসে গেলে হ্যাঙ্গামা একটা বাধবেই — হয় কাউণ্টারে, না হয় পরস্পরের মধ্যে। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ গেলবার চেষ্টা করবে, না হয় চ্যালেঞ্জ ক'রে বসবে টেবলে ঘুষি মেরে — মদে জল মেশানো হয়েছে। সে-অবস্থার জন্যে চৌধুরীর পোষা আছে দু-জন কুঁদো কুঁদো এ্যাংলো। তারা এগিয়ে আসে। সব সময় কাউণ্টারেব পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চৌধুবী গিয়ে জনিকে পরিচিত কবিয়ে দেয় নাবিক কটির সঙ্গে — বলে তার তিন ছেলের মৃত্যুব কথা, বাইফেলে এবোপ্লেন নামানোর রহস্য। নাবিক কটি হাসে হো-হো ক'রে। মরা আলোব ঠাণ্ডা আমেজ হঠাৎ চমকে উঠে যেন ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়।

'ক্ষমা করো — ক্ষমা করো আমাকে।' জনিব কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে এবার ঝাঁকানি দেয় রুখে দাঁড়ানো নাবিকটি। বলে, 'আমাবও এক ভাই মারা গেছে বার্মা ফ্রণ্টে। পাইলট ছিল। জানো?'

জনির কান্না থেমে আসে আস্তে আস্তে।

'সত্যিই আমি দুঃখিত।' রুখে দাঁড়ানো নাবিকটি ঘুরে দাঁড়ায় এবার সিধে হয়ে — চোখ চালিয়ে দেয় হলেব এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। হঠাৎ লোকটা যেন মুগ্ধ হয়ে যায় — বলে ওঠে, 'ওয়েল — ফাইন গ্যাদারিং জো — রিয়েলি। হুইস্কি — হে-এ-এ — ড্রিঙ্কস ফর অল।'

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত গলায় তার উদার ঘোষণা — হলের সমবেত জনমণ্ডলীকে হুইস্কিতে আমন্ত্রণ ক'রে বসলো। চঞ্চল হয়ে ওঠে চৌধুরী — চঞ্চল হয়ে ওঠে বয় বেয়ারার দল। হলের মাঝখানে হরিশ দত্তের টেবল থেকে প্রৌঢ়

সম্পাদকটি ঝিম মেরে ছিল শূন্য গেলাসের সামনে — হঠাৎ সে অত্যন্ত জড়িত সস্তা গলায় 'থ্রি চিয়াস' দিয়ে বসে একটা।

রাত বাড়ছে। কথা বাড়ছে। ভেঙে যাচ্ছে মরা আলোর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ। স্টিল মার্চেন্টের দ্বিতীয় পক্ষের কেবিনে একে একে যাচ্ছে আইস-ক্রীম, পেষ্ট্রি, কলা, চকোলেট। আর মাঝে মাঝে চৌধুরী স্বয়ং। মাঝে মাঝে জান্তব পরিতৃপ্তির শব্দ। উত্তেজিত চৌধুরী — শাণিত দৃষ্টি শিকার ধরার মতো। হঠাৎ অত্যন্ত ঋজু দেখায় তাকে — অত্যন্ত স্মার্ট। নিষ্প্রভ কোণের টেবলটায় এসে বসে সে আবার — ধারালো চোখ নিবদ্ধ থাকে হলের সর্বত্র। তারক ঠিকই বলেছিল — চৌধুরী যেন ভুলেই গেছে কোথায় কাকে সঙ্গে নিয়ে কেন তার যাওয়ার কথা ছিল। মিনিটের পর মিনিট গড়িয়ে চললো। তারপর ঘণ্টা।

অরুণ তার কথা পাড়বার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল। চৌধুরীকে একটু শান্ত হতে দেখে বললো, 'প্রসাদের খবর রাখো ?'

'রাখি কিছু কিছু।' চৌধুরী বললো, 'নাবিক বিদ্রোহের হাঙ্গামার সময় পাড়ায় মাতব্বরি করতে গিয়েছিল, তারপর বৃটিশ বুলেটে ধরাশায়ী। তাই না ?'

'তাই বটে।' অরুণ বললো, 'হাসপাতালে আছে এখনও — তবে একটি পা গেছে। তার পা চাই — টাকা দাও তোমরা বন্ধুরা যে যা পারো।'

সবাই চুপ।

মাখন বললো, 'তার অবস্থা তো তা হলে —'

অরুণ তার কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে উঠলো, 'তোমার চেয়েও খারাপ। অতীব মন্দ : আর পারছে না।'

তারক স্থির দৃষ্টিতে অরুণের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'একটা কথা অরুণ। প্রসাদের অবস্থা জানি, তার চলবার পা চাই — তাও

বুঝলাম। কিন্তু পা-শব্দটা কি তুমি এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করছো?'

'ধরো তাই।' অরুণ ম্লান হেসে বললো, 'একটা কাঠের নকল পা-ই শুধু নয়। সে আর কটা টাকা!'

চৌধুরী বললো, 'কিন্তু বিয়ে করলে সে তো শ্বশুরের অনেক টাকা পাবে। সেইটে করে ফেলুক এবার।— বাপের এক মেয়ে।—'

'আরতি মিত্তিরের কথা বলছো তো?' অরুণ হেসে বললো, 'সে এখন অন্যত্র।'

'তার মানে?' চৌধুরী অবাক হয়ে বললো, 'সবই তো শুনেছিলাম ঠিক ঠাক। মস্ত স্বদেশভক্ত মেয়ে!'

'সে ভক্তি তার অচলাই আছে।' অরুণ হেসে বললো, 'মেয়েটির দৃঢ় সঙ্কল্প — একটি নেতাকেই সে বিয়ে করবে। নাবিক বিদ্রোহ ফেঁসে গেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের তোড়জোড় চলেছে দিল্লীতে। ওসবের আর কোনো আশা নেই — তাই প্রসাদও খতম।'

সুধীর উৎসাহিত হয়ে বললো, 'গুড। কিন্তু আরতি মিত্তিরের এখন কে? কংগ্রেস না লীগ?'

'সেইটে ঠিক জানিনে।' অরুণ হেসে বললো, 'তবে সব সময়েই সে দুটোর মাঝখানে থাকে। বুদ্ধিমান মেয়ে। ও কথা থাক। এখন টাকার কথা বলো।'

সবাই বলে, দেবো। তারপর চুপ ক'রে যায়। চুপ ক'রে যায় হঠাৎ একেবারে। তারপর কোনো কথা যেন আর জমে না। রাত হলো। হলভরা ক্লান্ত বিষণ্ণ গুঞ্জন একটি গড়িয়ে গড়িয়ে আসে এই নিষ্প্রভ কোণটার দিকে।

সুধীর উঠলো। হলের দিকে ফিরে হঠাৎ থমকে গেল সে।

'কি হলো!' বলে অরুণও তাকালো তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে।

বেঁটে খাটো পাছাভারী গোলগাল মেয়ে একটি, শ্যাম্পু করা সুন্দর একরাশ চুলের নিচে তার বিলেতি বেগুনের মতো টুকটুকে গোল মুখটি। হল অতিক্রম ক'রে এসে দাঁড়ালো হরিশ দত্তের টেবিলে। হরিশ দত্ত শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। চলুন এবার — রাত হলো।'

রাত হলো। এগারোটা।

অরুণ তাড়া দিল, 'চলো।'

'একটু দাঁড়িয়ে।' সুধীর হরিশ দত্তের টেবলের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'ওরা চলে যাক।'

'কে?'

'কোনো আই-সি-এস কর্মচারীর বৌ — চললো কোনো মন্ত্রীকে ভজাতে। স্বামী বিপদে পড়েছে একটু। এর বেশী আর কিছু বলতে পারব না। আড়কাঠি আমার উপরওয়ালা। সামনাসামনি যেতে লজ্জা পাচ্ছি অরুণ।'

অরুণ হেসে বললো, 'ব্যাপারটা নিশ্চয় বড় গোছের চুরির।'

'বলতে পারি না। সাংবাদিক সভ্যতায় বাধছে।' হাসলো সুধীর।

ওরা চলে গেল। মেয়েটির আহ্লাদি আহ্লাদি হাঁটার পাশে বেঁটে মোটা হরিশ দত্তের হাঁটুনিটাকে মনে হয় ব্যাঙের থপথপানির মতো। সুধীর চেয়ে আছে এক দৃষ্টে। হাসি পায় তার। হঠাৎ হো-হো করে কাঁধ-মোটা নাবিকটির মতো হেসে উঠতে ইচ্ছে করে তার। মুহূর্তের ক্ষ্যাপামীর মতো! কি বিশ্রী ভাবে হাঁটছে হরিশ দত্ত!···

'প্রভাবের উপযুক্ত সময়। চলো — রজনী গভীর হলো।' অরুণ টেনে টেনে বললো তার স্বাভাবিক মৃদু চিকন গলায়।

হল-ভরা লোকজন। রাত বাড়ছে। কথা বাড়ছে। ঠাণ্ডা মরা আলোয় যেন এক ঝাঁক মাছির শব্দ: ভন্ ভন্ — ভন্ ভন্।

ওরা বার ছেড়ে পথে নামলো। আর কোনো কথা হয় না ওদের দু-জনের মধ্যে। কেমন যেন খাপছাড়া — ছেঁড়া, ভাঙা ভাঙা মনে হয় সুধীরের। বহুদিনের পুরানো উদ্দাম একটা ধারাকে আর যেন খুঁজে পায় না সে। বাইরে এসেই মনে হয় এটা। শুধু কানে লেগে আছে তখনও একটা জমাট ঠাণ্ডার ভন্‌ভনানি। পাশে পাশে হাঁটছে অরুণ। পথ হাঁটছে — আর তাকিয়ে আছে — মনে হচ্ছে ফোর্টের দিকের অন্ধকার আকাশে আটকানো একফালি অনাবশ্যক চাঁদের দিকে। কি জানি কেন, হঠাৎ ভালো লেগে যায় তার অরুণের রোগা রোগা ধারালো বুদ্ধিমান মুখটা। সে মুখ অন্তরের গভীরে থিতিয়ে থিতিয়ে যেন কোনো সুন্দর একটা সুর ভাঁজছে — মুখে তারই একটা চাপা আভাস: হয়তো সে গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে উঠবে এখুনি। হয়তো বিপ্লবের গান। জনবিরল পথ। ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানের আহ্বানে অশ্লীল ইয়ার্কি। একটি খালি রিক্সা চলে গেল — কেমন ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ভুতুড়ে। ঠুন ঠুন ঘণ্টার শব্দটা যেন পথের ধুলোয় খসে খসে পড়ে হারিয়ে গেল।

সবটা কেমন তালকাটা — নিরুদ্দেশ। উড়ে যাওয়া — ছিঁড়ে যাওয়া। আর তা ছিঁড়বেই — এমনিই হয়: এই কথাটা বারে বারে মনে হয় সুধীরের। অরুণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাস ধরলো দক্ষিণমুখো।

হ্যাঁ, ছিঁড়ে যাওয়া — উড়ে যাওয়া। এ ক'বছরে একটা ওলটপালট হয়ে গেছে পৃথিবী জুড়ে। এসেছে নতুন। এসেছে রক্তক্ষয়ী রূপান্তর। ইওরোপ, চীন, ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু কলকাতা? ভারতবর্ষ? বেচারী অবনী। অরুণ। আর জনি। গড়ের মাঠের শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় তার মুচি বৌকে। ধর্ষিত — ক্লান্ত — অসুস্থ। পাড়ার এক প্রান্তে শহর সীমান্ত-ছোঁয়া রেল লাইনের পাশ ঘেঁষে এক খোলার বস্তিতে বুড়ো মুচি ভগবান দাস মুখ নিচু করে কাজ করে যেত সারা দিন — আর দুই

বৌ তার ঝগড়া করতো, প্রায়ই লেগে থাকতো তাদের চুলোচুলি আর গালাগালি! আশ্চর্য! একটি কথাও বলতো না ভগবান দাস। কখনো বা দেখা যেত, বুড়োর দুই পাশে বসে দুই বৌ কাজ করে যাচ্ছে এক মনে — সেলাই, সারাই, কাটাকুটি। এমনি বসেছিল একদিন — মিলিটারী ট্রাক একখানা হুস্ করে এসে থামলো সামনে। ঘাড়ে গর্দানে কুঁদো শ্বেতকায় সৈনিক কয়েকজনা ট্রাক থেকে নেমে কোল-পাঁজা করে তুলে নিয়ে গেল ভগবান দাসের সতেরো বছরের ছোট বৌটিকে। ট্রাকের উপরেই একজন উপুড় হয়ে পড়ে তাকে নিয়ে। পাড়ায় হৈ হল্লা আস্ফালন। ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল ট্রাকটা। সেদিনও ভগবান দাস চুপ। ট্রাকটা চলে গেল শহর সীমান্তের রেল লাইন পেরিয়ে। প্রায় সাত দিন পরে ফিরে এলো মুচি-বৌ। এসেই নিল বিছানা। ঝগড়াটে সতীনটা ওষুধ আনতে যেত পাড়ার ডাক্তারখানায়।— সুস্থ হয়ে উঠলো মুচি-বৌ কয়েকদিন বাদে। আবার একদিন এলো ট্রাকটি। তারপর এই ট্রাক আসা-যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেল যেন। মুচি-বৌ ফিরে এসে শুধু বিছানা নিত। যেত যেদিন সেদিন রেল লাইনের পাশ থেকে হাওয়ায় ভেসে আসতো সমবেত কণ্ঠের খুব বিষণ্ণ সুর একটা। গানের পদগুলি যেন কাঁপতো অন্ধকার হাওয়ায়!—

You are always in my heart
Even though you are far away...

... যতো দূরেই থাক তুমি, তুমি আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে।—

সে কি প্রিয়া? স্বদেশ? বৃটেন? আমেরিকা? কি জানি, কোন জাতের মানুষ। দূর শহরতলীর অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত সুধীরের — গভীর অরণ্যের মাঝখানে সারারাত জেগে জেগে সে যেন একপাল নেকড়ের ক্ষুধার্ত আর্তনাদ শুনছে। শেষ দেখেছিল সে মুচি-বৌকে — ভগবান দাস লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রেছে তাকে। যুদ্ধ থেমে গেছে তখন। মুচি-বৌয়ের মুখে অশ্লীল, নাকি গালাগালি — ভেজা ভেজা,

অভিসম্পাত না কান্না — বোঝা যায় না। সর্বাঙ্গে চাকা চাকা ঘা। ধর্ষিতা — ক্লান্ত — অসুস্থ। ভারতবর্ষ। প্রসাদের ঠ্যাং ! হরিশ দত্ত — পাছা ভারি মেয়েটি। সমস্ত চেতনায় যেন অবরুদ্ধতা। বড ক্লান্ত মনে হচ্ছে সুধীরের — পরিশ্রান্ত। বাস থেকে নামলো।

এবার কানা-গলি। বাড়ীর দরজা। মাধুরী।

মাধুরী তারই জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। খেতে দিতে দিতে হাসি মুখে বললো, 'আমি কিন্তু জয়ন্তীকে আজ সব বলেছি সুধীরদা।'

সুধীর অন্যমনস্ক। অন্যমনেই সে বললো, 'কি বলেছ ?'

'কি আবার — বিয়ের কথা।'

সুধীর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো, 'শুনে বন্ধুটি তোমার উথলে উঠে কালই চাকরী ছাড়বার নোটিশ দেবে বলে গেল বুঝি ?'

'তা কেন ?'

'না হলে বিয়ের সুখ কি ?'

'হলো না।' মাধুরী নিঃশব্দে হাসলো।

'তবে ? আচ্ছা, এবার ঠিক ঠিক বলছি শোনো। তোমার সব কথা ধৈর্য ধরে শুনে শেষ কালে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, সবই তো বুঝলাম মাধুরী — কিন্তু লোকটির পুঁজি কি ? দেখি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে — শাঁসালো ধনী মানী কেউ আসে কিনা।'

'ছি-ছি-ছি। মাধুরী চটে গিয়ে বললো, 'খারাপ ছাড়া আপনি কিছু ভাবতেও পারেন না। বড় লোকের ছেলের পেছনে মনে মনেও কুকুরের মতো ছোটার মেয়ে সে নয়। সে যা চায় — সে যা ভালোবাসে, তাতে অতি বড় হতভাগাও সুখী হবে জীবনে।'

সুধীর হেসে বললো, 'কুকুরের কথা বলছি না — এ জীবন-সংগ্রাম, মেয়েদের চিরকেলে নিরাপত্তার কথা মাধুরী।'

মাধুরী যেন রাগ করেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুধীর শুধু একটু হাসলো : সুখী হবে? হায় কানা-গলির জীবন!

সারা সন্ধ্যেটা তখনও ঘনঘোর হয়ে আছে সুধীরের মনে। অরুণ আর তার মেসের পাশের ভুতুড়ে বাড়িগুলি, চৌধুরী আর তার রেস্তোরাঁ-বার, মাখন তারক এমনি আরও অনেকগুলি মুখ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন — মেলে ধরেছে তাদের সমস্ত জীবনের কাহিনী। তার মাঝখানে ঘনঘোর হয়ে আছে সুধীরের নিজের জীবনও — অতীতের অনেকগুলি বছর। সেদিনের আশা-স্বপ্ন, ভালোবাসা আর ধ্যান — কামনাময় অতীতের অসংখ্য কাহিনীর দিকে তাকিয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে তার। না — সেদিনের ব্যর্থতার জন্যে কোনো বেদনাবোধ নেই তার, কোনো মায়া নেই। চৌধুরী, মাখন, তারক — সেদিনের গোটা পরিবেশটা ঠিক যেমনটি থাকবার কথা তেমনিই আছে। কোথাও পরিবর্তনের আঁচ লাগেনি এতটুকু, পরস্পরকে তেমনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঠকিয়ে চলেছে ওরা — চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মপ্রবঞ্চনার ইতিহাস। মিথ্যা কথা বলছে আর ভালোবাসছে। আর তর্ক করে চলেছে বুদ্ধিমান মানুষের মতো — ঘোষণা করছে নিজেদের অস্তিত্বটুকু। বদলে গেছে শুধু অরুণ! মর্মে মর্মে চেনা অপরিবর্তনীয় একটা জগতের মাঝখানে তার পরিবর্তনটা যেমন খাপছাড়া তেমনি হঠাৎ অনাবশ্যক অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়। এখনও সে স্বপ্ন দেখে — স্বপ্ন দেখে ভাবীকালের, মনে মনে হয়তো রচনা করে আগামী দিনের একটা জগত ও জীবন। আরও একজন স্বপ্ন দেখে। সে অবনী। এই দু-জনকে সুধীরের হঠাৎ মনে হয় প্রেতমূর্তির মতো — নিঃসঙ্গ, ছায়াময়, হয়তো আরও আছে এমনি নিঃসঙ্গ কয়েকটি ছায়ামূর্তি — অদম্য কামনায় স্বপ্ন রচনা করে যায় একান্ত নীরবে। আর তাদের ঘিরে বিরাট এই শহরের স্খলনের, ব্যর্থতার, মত্ততার ঘূর্ণ্যমান একটা কোলাহল চৌধুরীর রেস্তোরাঁর মতো ভন্ ভন্ করছে —

আশা-আশ্বাসহীন, বিশ্বাসহীন, ভ্রষ্ট। মাধুরীর মুখটা মনে পড়ে। এত সব কিছুর মাঝখানে তার শান্ত বোকা-বোকা মুখের হাসি আর জয়ন্তীর প্রসঙ্গ — এতে সুধীরের গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করবে না!

সমস্ত চিন্তা মন থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে সেদিনের কাগজগুলোর ওপরে মন দিল সুধীর। সেখানেও কিসে যেন পেছু ধাওয়া করে। পেছু ধাওয়া করে বিগত বছরগুলির পুঞ্জিত ব্যর্থতা — আজকের সন্ধ্যাটির মতো আরও অনেকগুলি সন্ধ্যা, অনেকগুলি মুখ আর বহুদিনের বহুভাবে পরিচিত এই শহর। মন্ত্রী-মিশনের সাম্রাজ্যবাদী ভালোমানুষির ছদ্মবেশ আর জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক দর-কষাকষি এবং লম্বা লম্বা বিবৃতির মাঝখানে ফুটে ওঠে অবনীর মুখ। অরুণের মুখ। অবদমিত বিদ্রোহের কোন এক ছিঁড়ে-ফেলা রিপোর্ট, ধর্মঘট-মিছিল-বেপোরোয়া গুলি। উচ্ছ্বসিত অবনী আর অরুণের বিশীর্ণ মুখের দৃঢ়তা — বিপ্লব! .. এরই পাশাপাশি মনে পড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে রেডিও ঘিরে দাঁড়ানো উৎকর্ণ নাগরিক ভিড়ের উৎসুক মুখগুলি। এই সেই শহর! .

পেছন থেকে হঠাৎ মাধুরী বলে উঠলো, 'একা একা অমন মুখ টিপে হাসছেন যে?'

'খুব হো-হো করে হাসতে পারিনি — না?' বলে সুধীর ফিরে তাকালো। বললো, 'সেই রকমই অবিশ্যি হাসা উচিত ছিল।'

'কেন?'

'মরা বড শক্ত মাধুরী,' সুধীর বললো, 'একটা মানুষ সহজে মরে না। কাগজে একটা খবর পড়ছিলাম। একটা লোক তিনবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে — মরেনি। তাই ভাবছিলাম মেরে ফেলবার মতো মোক্ষম একটা কিছু না করলে সহজে মানুষ মরে না।'

এই লোকটার এই সহজ কথাগুলোর পেছনে থাবায় লুকানো যেন নখের তীক্ষ্ণতা আছে। মাধুরীর মুখ চোখ গম্ভীর হয়ে যায়। খুব নিরীহ

কণ্ঠে বললো, 'কি জানি সুধীরদা। আপনার কথা শুনে শুনে আমার নিজেরই মরতে ইচ্ছে করে — দম আটকে আসে।'

মাধুরীর বলা কথাগুলি হঠাৎ কেমন ভারী ভারী লাগে। সুধীর তার দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। গোটা বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘুমে ঘোর। রাত হয়েছে। নিভে গেছে সব ঘরের আলো। বাইরে গলির ভুতুড়ে অন্ধকারে একটা গ্যাসের বাতি নিভে যাওয়ার আগের মুহূর্তে খাবি খাচ্ছে। বস্তির একটি মাতাল চলে গেল টলতে টলতে — কানা-গলির কানা মুখের বস্তির দিকে। গোটা এই নিঃশব্দে থিতানো পরিবেশের মধ্যে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অরুণের মুখটা আবার মনে পড়ে যায় সুধীরের — ফোর্টের দিকে সেই নিষ্প্রয়োজন বাঁকা চাঁদের মুখোমুখি তাকানো নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ একটি মুখ। তার সঙ্গে এর যেন কোথায় মিল আছে।

সুধীর আস্তে আস্তে বললো, 'দম আটকে আসে — না?'

'আসে সুধীরদা।'—

মাধুরীর মৃদুকণ্ঠের ফিসফিসানির মতো কথাগুলি শোনায় কান্নার মতো। পরিবেশটা বড় ভারী মনে হয় — অসহ্য মনে হয় সুধীরের। হো-হো করে হেসে সবটাকে ভেঙে খান খান করে দিতে ইচ্ছে করে তার। রেস্তোরাঁর সেই মাতাল নাবিকটির মতো। তার পর ঘুষি মেরে বসবে টেবিলে — নিরুদ্দেশ গালাগালি দিয়ে — হাওয়ায় — শূন্যে :

'ব্লাডি — সোয়াইন'—

বাস। চুকেবুকে গেল। হারিয়ে গেল। কিন্তু মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের একটা বুভুক্ষু আত্মার মতো। দম আটকে আসে তার।··· সে যেন ভোলে না অনেক কিছু — কিছু হারায় না! বরং মূর্তিমান একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার কেমন এক রকমের বিষণ্ণ অসহায়তা। এতদিনে সেইটে যেন নতুন করে সুধীরের

চোখে পড়ে। ভয় করে হঠাৎ সুধীরের। হয়তো মেয়েটা কো এক অসম্ভব কথা বলে বসবে। বিষণ্ণ চোখে ওর সেই প্রত্যাশা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে সুধীর। তাকে কিছু একটা জবাব দিতে বাকি আছে যেন।

মাধুরী তেমনি মৃদু কণ্ঠে বললো, 'এ বাড়িতে ঢোকার পর কানা-গলিটাকে মর্মে মর্মে বুঝেছি আমি। তবে আপনার মতো হিসেবনিকেশ অতো বুঝিনে — সবটাকে মেনে নিয়েছি ভাগ্য বলে।'

'ভাগ্য! না — ?' সুধীর তার স্তব্ধতা থেকে এমনভাবে বলে উঠলো — যেন কথাটা খুব সহজবোধ্য লাগছে না তার কাছে।

মাধুরী বললো, 'হ্যাঁ — ভাগ্য। কিন্তু জয়ন্তী শুনে বলে অন্য কথা — উল্টো কথা।'

'কি বলে ?'

জয়ন্তীর কথা এসে পড়ে। সেদিনের বিষণ্ণ বিকেলের আলোয় স্বপ্ন দেখা যে এক নতুন জগত একটাকে মেলে ধবেছিল জয়ন্তী মাধুরীর সামনে — তাকে সে উপলব্ধি করে মনে মনে, বলতে পারে না। কর্মব্যস্ত কোলাহল-মুখর পৃথিবীর মাঝখানে কোনো দুটি জীবনের কাহিনী — কানা-গলির জীর্ণ পুরানো এই বাড়িটার অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে — নাগালের বাইরে। হয়তো সেখানে আছে সুখ, আছে শ্রী — জীবনের অবদমিত-কামনাগুলো হয়তো প্রাণ পাবে কোনো দিন সেখানে। জয়ন্তী প্রাণ ভরে কাজ করবে, সংসার গড়বে, গান গাইবে — ছুটবে পাহাড়ে সমুদ্রে। সহস্রধারায় উচ্ছলে পড়বে জীবন। সে তার অনাগত স্বপ্ন। তবু সে যেন জীবনের মূর্ত প্রতীক। তার মতো আবেগ দিয়ে বলতে পারে না মাধুরী — তবু বলে আস্তে আস্তে, ভেবে ভেবে। বলবার চেষ্টা করে সেই কথাটা — হয়তো জীবন আছে। কথায় তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বিষণ্ণ আবেগ একটা জড়িয়ে থাকে। তারপর সে চুপ ক'রে যায়। অপেক্ষা করে নিঃশব্দে।

সুধীর হঠাৎ বলে উঠলো, 'ওসব মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে কথা?'

'হ্যাঁ মাধুরী।' সুধীর তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো, 'মিথ্যে কথা বলতে আমরা ভয়ানক ভালোবাসি। এমন ভালোবাসি আর এমনভাবে বলি যে মনে হবে সেগুলো সত্যিই বোধ করি।'

'জয়ন্তীর কাছে এ কথা বললে সে ধমকে উঠতো।' মাধুরী ম্লান হেসে বললো, 'বলতো — অবিশ্বাসী।'

সুধীর বললো, 'বোধহয় তোমার বন্ধুটি কারুকে ভালবাসে মাধুরী — তাই মিথ্যেগুলো অতো সত্যি মনে হচ্ছে আর সত্যিগুলো দারুণ অবিশ্বাসের ব্যাপার।'

মাধুরী বললো, 'জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললে — না, তার সুযোগ নাকি জীবনে তার ঘটেনি।'

সুধীর চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'মিথ্যেগুলো তবে এখনও সে বোঝে না — জানে না। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেছি মাধুরী — আমি জানি।'

'কি জানি।' মাধুরী বললো, 'জানিনে আপনার হিসেব নিকেশের পালা কবে শেষ হবে।— তবে সে যদি এ বাড়িতে এসে থাকতো — হয়তো, হয়তো — আমি হাঁফ ছেড়ে কিছুটা বাঁচতাম সুধীরদা।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কথাগুলো মাধুরীর শোনায় আর্তনাদের মতো। সুধীর স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। মেয়েটিকে নতুন ক'রে চেনে আজ সে। মায়া হয়, করুণা হয় হঠাৎ। আস্তে আস্তে বললো:

'হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে — না?'

আবেগে মাধুরী বলে উঠলো, 'বাঁচতাম সুধীরদা।'

একটু থেমে মাধুরী আবার বললো, 'হিসেবনিকেশ আপনি কি মেলাবেন জানি না। জয়ন্তী বলে — দু-জনের পরিশ্রমে কেন একটা সংসার সুখী হবে

পারবে না? তাই আমার মনে হয় — তার কথাই ঠিক। সে যদি আসে!— তারপর? তারপর আপনারা দু-জন এখানে থাকুন — অথবা চলে যান।'

সুধীর হালকা গলায় বললো, 'তাতে দম আটকে মরা থেকে তুমি বাঁচবে কেমন ক'রে মাধুরী?'

'আমি!' বলে ম্লানভাবে একটু হাসলো মাধুরী। বললো, 'আমার কি! আমার কিছু নেই সুধীরদা।'—

নিরীহ শান্ত বোকা-বোকা মাধুরীর দিকে সুধীর চেয়ে রইলো। এতটুকু দুর্বোধ্যতা নেই তার মধ্যে। এক নিমেষে সব চুকিয়ে দিয়ে সে যেন হাত গুটিয়ে বসেছে। কিছুই নেই তার।

সুধীর দরদভরা কণ্ঠে বললো, 'এখন শুতে যাও — রাত হলো।'

মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুধীর বসে বসে তার কথাই ভাবে। তার বিষণ্ণ কথাগুলির মধ্যে আর একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায় — সে জয়ন্তী। তার স্বপ্ন, তার আশা ও বিশ্বাস আজকের আশা-আশ্বাসহীন, ভ্রষ্ট গোটা সন্ধ্যাটার ওপরে এসে পড়ে যেন হুড়মুড় ক'রে। স্বপ্নে তার সবল আবেগ, আশা তার দুরন্ত। অন্ধকারে যেন ডানা ঝাপটায় সবেগে। তার সামনে বসে থাকে সুধীর স্তব্ধ হয়ে। অসংখ্য এলোমেলো চিন্তা ভিড় ক'রে আসে মাথায়।

তারপর সে চঞ্চলভাবে পায়চারী করে ঘরের এপাশ ওপাশ। যেন পথ খুঁজছে। পথ খুঁজছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে, ব্যর্থতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে। কি চায় একটা মানুষ? অনেকগুলি ব্যর্থ বছর কাটিয়ে, অনেক মানুষের জীবন অতিক্রম ক'রে এসে অত্যন্ত সোজাসুজি বলতে ইচ্ছে করে তার: কিছু চায় না, কি চায় সে জানে না। অরুণ হলে হয়তো বলতো, সে চায় জীবন, জীবন আর ভালোবাসার মতো কিছু। এই কথাটাই ঘুরপাক খায় তার মনে। তার মধ্যে থেকে ভেসে ওঠে জয়ন্তীর মুখ — স্ফীত আবেগ — স্বপ্নসঙ্কুল — চওড়া চিবুকে তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

-সে এসে কাঁধ লাগাবে এ বাড়ির অচল চাকায়। দম আটকানো মাধুরী বাঁচবে হাঁফ ছেড়ে।

সুধীরের মনে পড়ে যায় তার বুড়ী ঠাকুমার কথা। সুধীর চক্রবর্তীর বৌ চাকরী করবে শুনলে বুড়ী বলতো, 'যতো ফিরিঙ্গী ঢঙ— চললুম আমি কাশী।'··· মনে পড়ে, তার এক দিদির ম্যাট্রিকটুকু পড়া নিয়ে বুড়ী কাশীযাত্রার উদ্যোগ করেছিল। দিদির বিয়ের কথা চলছিল তখন এক ছোকরা উকীলের সঙ্গে। মফঃস্বল কোর্টে তাব বাবার ছিল মস্ত পসার। ওয়ারিশানসূত্রে সেই পশার পাবে ছেলে — সমৃদ্ধি সচ্ছলতায় মেয়ে ভালোই থাকবে — এই ছিল বাবার আশা।

কিন্তু দিদি জানিয়েছিল, — 'আমি পড়বো এখন।'

তারপর বাড়িজুড়ে গোলমেলে কাণ্ড। ঠাকুমাব কাশীতে বাণপ্রস্থের উদ্যোগ। মা বাবার ধমক। কে যেন গিয়েছিল দিদির হয়ে ওকালতী করতে। বাবা বলেছিল:

'ক্ষেপেছ? এ রকম ছেলে হাতছাড়া হলে আব পাবো? পড়ার কি দরকার? মেয়ে কি চাকরী কববে?'

মেয়েদের লেখাপড়া — তখন যেন ছিল সৌখিনতা। চাকরীর প্রয়োজন হয়নি। স্ত্রী প্রতিপালন করতে না পাবলে স্বামীকে গাল পাড়তো লোকে হতভাগা বলে।

তারপর দিন বদলে গেছে। জয়ন্তীরা এগিয়ে এসেছে সংসারের চাকায় কাঁধ দিতে। রেণুর কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুধীরের। সে বেঁচে থাকলে ম্যাট্রিক দিত। তারপর কাঁধ লাগাতো এ সংসারেব অচল চাকায় — অথবা অন্য কোনো নতুন সংসারে। এই হলো জীবন আর ভালোবাসার মতো একজন!—

ঘুম আসছে না। অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে সুধীর খোলা দরোজার সামনে দাঁড়ালো এসে। ঘরের সবগুলি আলো নেভানো।

অন্ধকার বারান্দা। পাতলা ফিনফিনে আলো একটু এসে পড়েছে সেখানে — হয়তো তারাভরা আকাশের আলো। অন্ধকারে আবৃত সেই আলো-ছায়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে রেলিংএ কনুই রেখে। মাধুরী। হয়তো সে আকাশ দেখছে। হয়তো তারও ঘুম আসছে না। হয়তো দম নিচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে একভাবে। মাথা গুঁজলো মাধুরী দুই হাতের ভাঁজে। মুহূর্তগুলি গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে যাচ্ছে এ-বাড়ির দম-আটকানো মুহূর্ত। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে সেখান থেকে চলে গেল সে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সুধীর। তারপর সরে এলো আবার ঘরের অন্ধকার গহ্বরে। টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায় আর মনে পড়লো অরুণের সেই কথা : ভালোবাসার মতো একজন।…

স্ত্রীলোক সুধীরের জীবনে আকস্মিক নয় — নতুনও নয়। তবু অরুণের ভালোবাসা তাকে তাজ্জব করে দিয়েছিল একদিন। বেঁটে রোগা একটা কুঁজো মেয়ে, ঠোঁটের ওপরে বাদলা পোকার ডানার মতো গোঁপের রেখা এবং মিথ্যেবাদী, অতএব চতুর। অরুণ জানতো। তবু কাব্য করতো। কি পেয়েছিল তার মধ্যে অরুণ — তা সুধীরের ধারণার অতীত।

'অবাক হই। কি আছে বলতে পারো?' সুধীর জিজ্ঞেস করেছিল একদিন ডাক্তার বন্ধু অবিনাশকে।

'ইডিয়ট!' অবিনাশ গাল দিয়ে বলেছিল, 'এসো আমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যাবেলা।'

পাঁচ টাকা দিয়ে অবিনাশ সুধীরকে নিয়ে গিয়েছিল এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের কাছে। বলেছিল :

'দ্যাখো।'—

একটি তরুণী — ছিপছিপে, নগ্ন। মুখে তার ছলছলানো হাসি — দেহের মতোই। চেয়ে চেয়ে শুধু সবটুকু প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল সুধীরের — হাসিটুকু পর্যন্ত। এতটুকু যেন বাদ দেওয়া যায় না।

বাইরে বেরিয়ে এসে অবিনাশ বলেছিল, 'বুঝলে ?'

'এই কি সব ?'—

'ইডিয়ট !' আবার গাল দিয়ে উঠেছিল অবিনাশ, 'আর কি ?'

'আর কিছু ?'

'আর ? আর একটা মুহূর্ত। এবং এই সব।'

শুনে তারক তার স্বভাবসিদ্ধ নিঃশব্দ গাম্ভীর্য থেকে বলে উঠেছিল আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে নেড়ে, 'সমালোচনার দরকার।'

চৌধুরী হেসে উঠেছিল হো-হো করে।

চৌধুরীর হাসি, তারক আর অবিনাশ।... অবিনাশ কি সুখী ? মনে মনে জিজ্ঞাসা করে সে আজ আর আওড়ায় অরুণের কথা : ভালোবাসার মতো একজন। কিন্তু জীবন ?— সব কিছু থিতিয়ে আসছে সুধীরের ক্লান্ত চেতনায়। তার মধ্যেও একটা জিজ্ঞাসা ঋজুভাবে মাথা তুলে থাকে : ... কিন্তু জীবন ?— এলো না হয় জয়ন্তী এ-বাড়ির অচল চাকায় কাঁধ লাগাতে : আত্ম-বিশ্বাসে স্বপ্নে উচ্ছ্বসিত সে — সুধীরকে বলে যে অবিশ্বাসী। তারপর কতদিন ? কতদূর ? প্রস্তুত কানা-গলির পথ ! হ্যাঁ, সে বিশ্বাস করে না। একদিকে তারক, মাখন, চৌধুরী আর অতিপরিচিত গোটা পুরাতন কালটা। আর একদিকে অরুণ, অবনী, ঠ্যাংকাটা প্রসাদ — জয়ন্তীর আশা। কোনোটাই বিশ্বাস্ করে না সে। বিশ্বাস করে না। না।

আস্তে আস্তে তন্দ্রায় থিতিয়ে আসছে সব। চাপা পড়ে যাচ্ছে।—

অরুণ।—

তার প্রেম।—

তার বিপ্লব।—

জয়ন্তী।—

সেই নগ্ন এ্যাংলো মেয়েটি।—

সেই মেয়েটি।—

প্রয়োজন।—

নয়।—

পরের দিন ট্রাম-স্টপেজে জয়ন্তীর সঙ্গে সুধীরের দেখা। পরিচিতির চমকানো স্বচ্ছতা জয়ন্তীর চোখে। মুখে ঠোঁটচাপা হাসি। জয়ন্তীর পাশে আরও একটি মেয়ে। ফ্যাকাশে আর কুঁজো। গতরাত্রির নানান বিচ্ছিন্ন কথা মনে পড়ে যায় সুধীরের এক লহমায়। হাসি পায়। হয়তো জয়ন্তীর পাশের কুঁজো মেয়েটিও স্বপ্ন দেখে। খোঁজে, ঠোক্কর খায়, আর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে — মিথ্যে কথা বলতে ভালোবাসে।

ট্রাম এলো। জয়ন্তী আর তার বন্ধুটি উঠলো। সুধীর দাঁড়িয়ে রইলো। ট্রাম ছেড়ে দিল। জয়ন্তী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো — হাসলো মুখ টিপে।

সুধীর দাঁড়িয়ে আছে।

'কে ?' জয়ন্তীর বন্ধুটির চাপা জিজ্ঞাসায় অবরুদ্ধ কৌতূহল।

'কি বলবো।' জয়ন্তী হেসে বললো, 'একজন মস্ত এ্যাকাউন্টেন্ট।'

ওইটুকু কথাতেই সব শেষ হয়ে যায় না — এমন একটা চটুলতা জয়ন্তীর কথায়। তার মুখের হাসিটুকু মেলাতেও দেরি লাগে। এতদিনের একটি পুরাতন বন্ধুর এই রহস্যময়তা — জয়ন্তীর বন্ধুটি ক্ষুণ্ণ হয়।

সপ্রতিভ ভাবে জয়ন্তী বললো, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে নতুন আলাপ। তোকে বলা হয়নি। আজ বিকেলে বলবো সব — এক ধরনের অদ্ভুত লোক।'

কয়েকমুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকে জয়ন্তী। পাশের বন্ধুটির কাছ থেকে আর কোনো জিজ্ঞাসা ছিটকে আসে না। তবু আবার বলে চলে জয়ন্তী। বলে অবিশ্বাসী, নেতিবাদী একটা যুবকের কথা — বলে তার নিজেরও মতামত, প্রতিবাদ। বলে না শুধু সেই কথাটা — কেন এই মতামতের বিরোধিতা। — কি আসে যায় তাতে! তবু বলে যায় সে অনেক কথা। মাধুরীর কথাও এসে পড়ে : দম-আটকানো বেচারী মাধুরী।

কিন্তু পাশ থেকে কোনো সাড়া নেই — কেউ নেই যেন সেখানে। অথবা হয়তো আছে জয়ন্তীর কোন একটি বন্ধু, শোভা দাসগুপ্ত যার নাম — এত লোক আর এত কথার মাঝখানে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে যে হঠাৎ — উহু। জয়ন্তীর মৃদু অস্পষ্ট কথাগুলি ভেসে আসছে কানে — যা স্পর্শ করছে না তাকে এতটুকুও। জয়ন্তীর অসংখ্য কথার মাঝখানে, তার আশা ও উচ্ছ্বাসের, আত্মোপলব্ধির মাঝখানে তার যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। সে শুধু শুনে যাচ্ছে আর চেয়ে আছে নিঃশব্দে কর্মচঞ্চল মহানগরীর জন-জীবিকার স্রোতের দিকে। ভিক্ষুক, মজুর-মিস্ত্রী, কেরানী, ব্যবসাদার — ঘন জনারণ্যে শিকার-সন্ধানী।

—'মাধুরীর জন্যে কষ্ট হয়। সত্যি। সেদিন বললো — যদি সে-ও একটা কাজ-টাজ করতো।— দম আটকে আসে নাকি তার।' জয়ন্তীর মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠের দরদী কথা।

অসংখ্য এই মানুষের জনতার মধ্যে মাধুরী নামক কোনো একটি মেয়ে যদি তার মতো কাজ করতো — ছুটতো জীবিকার সন্ধানে: শোভা ভাবলো শুধু এইটুকু। আর ভাবলো: একই মুহূর্তে কর্মব্যস্ত এই শহরের এত লোকের মাঝখান তার নিজের অস্তিত্ব একটা আছে বটে। আবার নেইও। তবু ছুটেছে সে এতগুলো লোকের মাঝখানে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর গিলে ফেলবে সকলকে বিরাট একটা যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মুখ।

গড়ের মাঠের সবুজ বার্নিসের স্নিগ্ধতা শেষ হয়ে এলো। তারপর এসপ্লানেড — ডালহৌসী। যন্ত্রের রোমন্থন। ট্রামের গতি কমছে — ঘন জনতা চঞ্চল।

জয়ন্তী বললো, 'মাধুরী যদি সত্যই একটা কাজ পেত! লেখাপড়া বেশি করতে পারেনি বেচারী। ওর জন্যে দুঃখ হয়। স্বামী সামান্য চাকরী করে। তারপর।'— থেমে গেল জয়ন্তী।

চলে না — এসপ্লানেডের অফিসমুখো ছোটা অসংখ্য যুবক প্রৌঢ় বুড়োর

দিকে তাকিয়ে মনে হয় শোভার: থেমে যাওয়া ট্রামটার মতো আরও একটা অদৃশ্য জায়গায় কি একটা থেমে গেছে হাঁপাতে হাঁপাতে — চলে না। ঠেলতে হবে। তাই তার প্রয়োজন আছে। দাবী মেটাতে হবে নতুন ক্ষুধার। মেটাতেই হবে। তবু তার অস্তিত্ব নেই। এই কথাটা মনে হয় আজ হঠাৎ জয়ন্তীর পাশে বসে বসে। ভালো লাগে না।

এই ভালো-না-লাগাটুকু এতক্ষণে যেন চোখে পড়ে জয়ন্তীর। শোভার শীর্ণ মুখটা কেমন যেন কোণ-ঠাসা! জয়ন্তী হঠাৎ চুপ করে যায়। শোভা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে — একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার্ত মুখের ক্রোধের সামনে সে যেন অভিভূত, একান্ত বাধ্য শিকার। সমস্ত সত্তাকে তার চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সামনে নামলো শোভা। সাপ্লাই অফিসের কেরানী সে। জয়ন্তী বললো, 'বিকেলে বলবো সব।'

'আচ্ছা'—

শোভা দ্রুত রাস্তা পার হলো। তার বিবর্ণ মুখে নেই এতটুকু কৌতূহল। কেমন খটকা লাগে জয়ন্তীর। মনে করবার চেষ্টা করে — শোভা সারা পথ প্রায় কথাই বলেনি। অথচ এমনটা হয়নি কোনোদিন। তার বহুদিনের পুরানো বন্ধু। অফিসে আসে একসঙ্গে — ফেরেও একসঙ্গে। ভালো লাগে না জয়ন্তীর: শোভা খুশি হলো না কেন? কিছু তাকে বলবার ছিল যে!

ট্রাম এলো ডালহৌসী স্কোয়ার। নামলো জয়ন্তী। একটি সহকর্মিনী চলেছে আগে আগে। ডাকলো।

'পারুল!'

পারুল দাঁড়ালো। তারপর একসঙ্গে এগোলো দু-জন অফিসের দিকে।

'হঠাৎ অতো চনমনে দেখাচ্ছে কেন? ব্যাপার কি?' পারুল আড়চোখে চেয়ে বললো।

'চনমনে ?' জয়ন্তী হেসে বললো, 'ভালো লাগছে না। শোভা মন খারাপ করে দিয়ে গেল।'

'কেন ?'

'সেইটে বুঝতে পারছিনে। অথচ কেমন যেন খাপছাড়া মনে হলো তাকে।'

'হঠাৎ ?'

জয়ন্তী হেসে ফেলে বললো, 'ঠিক হঠাৎ না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নতুন আলাপ হয়েছে — তার কথা বলছিলুম। ও শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল।'

'বুঝেছি। আলাপটা কতদূর গড়িয়েছে তোমাদের ?'

'কি মনে হয় ?' বলে রহস্যময়ভাবে হাসলো জয়ন্তী।

'বটে ! তা হলে তো অনেক দূর।'

'কাঁচকলা বুঝেছ। ভদ্রলোক শুধু একটা হিসেব-নিকেশ করতে আসবেন — এই পর্যন্ত।'

'দূতীটি কে ?'

'আমার ইস্কুলের এক বন্ধু।'

কথায় ছেদ পড়লো। অফিসে ঢুকে এগোয় ওরা যে-যার বোর্ডের দিকে। তারপর গলায় ফোনের বাক্স বেঁধে মস্ত সুইচ-বোর্ডটার সামনে উঠ-বোস, ছুটোছুটি এপাশ ওপাশ — নম্বরের পর নম্বর, মহানগরীর উত্তর দক্ষিণ, পুব-পশ্চিমে : হ্যালো…হ্যালো…হ্যালো। সংখ্যাগুলো যেন পাগলের মতো ছুটোছুটি করে — দুটো হাত আর পা যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাগাল পায় না।

পাশের কোন ঘরে একটা মিহি ক্যাঁটকেটে গলা ফেটে পড়ে হঠাৎ — অত্যন্ত অভদ্র ভাবে। ইনচার্জ।

জয়ন্তী বললো, 'কার ওপরে ?'

'স্ — স্ — —।' পাশের বোর্ড থেকে পারুল হুঁশিয়ারী দিল, 'আসছে।'

জুতোর শব্দ কাছ থেকে দূরে মিলিয়ে গেল আবার।

জয়ন্তী বললো মৃদু কণ্ঠে, 'ডোরা বোধ হয়। নইলে অতো অসুখ আর হবে কার।'

'রাতভর মদ গিলবে — হবে না!'—

'কি করবে ও! বকের মতো ওর সেই হতচ্ছাড়া বয় ফ্রেণ্ড — সে চায় যে। ও দুঃখ্ করে — জানিস!'

'মরুক গে।'

'আমার দুঃখ্ হয় ওর জন্যে।'

হ্যালো — হ্যালো — হ্যালো।...

ছিটকে যায় দু-জনে দুদিকে আবার। ছুটোছুটি করে সারা বোর্ডময়। তারই মধ্যে জয়ন্তী কথা বলে। কিন্তু বড় একটা উত্তর আসে না পারুলের কাছ থেকে। ঘরের ছায়াম্লান আলোয় এক ধরনের বিষণ্ণতা ঢেকে রেখেছে তাকে — চোখের ঘন কালোয় ক্লান্তি। মুখটা শুধু টস্ টস্ করছে।

জয়ন্তী বললো, 'ভদ্রলোক যেদিন হিসেব-নিকেশ করতে আসবেন — কি বলবো বলতো পারুল। শুনি, তিনি নাকি মস্ত হিসেবী।'

'ভালই তো।'

এমন নিস্পৃহভাবে কথা বলে পারুল — জয়ন্তী থতোমতো খেয়ে তাকালো তার মুখের দিকে। মনে পড়ে যায় শোভার কথা। পারুলও তার পুরাতন বন্ধু — সহকর্মিনী। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করছে বহুদিন। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয় জয়ন্তী। কেন এমন হয়?

জয়ন্তী বললো, 'তোর সুবোধের খবর কি রে?'

কিন্তু তার উত্তর আসার আগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে পারুল। জয়ন্তী চিৎকার করে ওঠে। বোর্ড ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সবাই। একটা মিহি গলার কলগুঞ্জন গন্‌গন্ ক'রে ওঠে সারা ঘর ভরে।

পারুল ফিট হয়ে গেছে। পড়ে আছে তেমনি মুখ থুবড়ে। বোর্ড ছেড়ে এগোবার সাহস নেই কারুর — সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মতো।

জয়ন্তী এগিয়ে গেল।

ইনচার্জের জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকলো।

ক্যাঁটকেটে গলাটা ফেটে পড়ে হঠাৎ:

'ব্যাপার কি! এঁ্যা। দাঁড়িয়ে রইলে সবাই যে!'

কে যেন বললো শুধু, 'ফিট।'

'ফিট। তো তোমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছো কেন?' হুমড়ি-খাওয়া পারুলের দিকে এগিয়ে এলো ইনচার্জ। জয়ন্তীর দিকে রূঢ় চোখে চেয়ে বললো, 'তুমি এখানে কেন? তোমার বোর্ড কোথায়? তুমি নার্স না টেলিফোন গার্ল?'

'ও পড়ে গেল হঠাৎ। তাই — '

'তাতে তোমার কি? যাও তোমার বোর্ডে।'

জোড়া জোড়া চোখে শুধু ঘৃণা আর ধোঁয়াটে অসন্তোষ। সে চোখ আর যাই হোক কথা কয় না।

জয়ন্তী মুখচোখ লাল করে দাঁড়ালো গিয়ে নিজের বোর্ডে।

ইনচার্জ লোকজন এনে বার করে নিয়ে গেল মূর্ছিত পারুলকে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ। তারপর হঠাৎ একটা কলগুঞ্জন শুরু হয় বোর্ডে বোর্ডে।

'কি হলো ওর — এঁ্যা?'

'ওর শরীর খারাপ — মাস দুই-তিন বড্ড রোগা হয়ে গেছে ও।'

'কিন্তু দেখলে ইনচার্জের ব্যবহার! আমরা যেন চোর আর ও দারোগা।'

'ঝ্যাঁটা মারো মুখে।'

জয়ন্তী ঘুরে দাঁড়ালো হঠাৎ নিজের বোর্ডে — ফেটে পড়ে রাগে, ক্ষোভে, 'লজ্জা করে না পেছনে বলতে? সামনে ছিলে কোথায় সব?'

চুপ করে যায় সবাই। নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তীর ফুঁসে ওঠা মুখটার দিকে সবাই ··· তারপর নীরবে ঘুরে দাঁড়ায় যে-যার বোর্ডের দিকে।

'এ ব্যাপার তো নতুন নয়। পায়ে মাড়ানো জুতোর সুকতলা তোমরা — তাই মুখ বুজে সব সয়ে যাও। বুঝলে।'—

'ছুটির পর আলোচনা হবে জয়ন্তী', কোন বোর্ড থেকে কে যেন বললো ক্লান্ত কণ্ঠে।

বোর্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো জয়ন্তী। চটলে চোখে জল এসে পড়ে তার। বোর্ডটা ঝাপসা। তারই মধ্যে কাজ করে যায় সে। পারুলের শূন্য বোর্ড জয়ন্তীকে আর পাশের একজনকে ভাগ ক'রে নিতে হয়েছে। ইনচার্জ বলে পাঠিয়েছে, নতুন লোক নেই।

হ্যালো — হ্যালো — হ্যালো।— কর্মচঞ্চল — কলমুখর। পূবে পশ্চিমে দক্ষিণে উত্তরে। এর মাঝখানে পারুল রায় নামে পড়ে গিয়েছিল কে, কখন, কেন — সব যেন চাপা পড়ে যায়। তখন নিঃশব্দতার মাঝখানে শুধু শোনা যায় দু-একটি অস্পষ্ট অস্ফুট কথা, উড়ো ছেঁড়া খসে পড়া ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস। আর কিছু নয়।

অফিস থেকে বেরিয়েই জয়ন্তী এগোলো এসপ্লানেডের দিকে। শোভা অফিস থেকে বেরিয়ে দাঁড়াবে কার্জন পার্কের গেটের সামনে। এমনি চলে আসছে দীর্ঘ দিন — তারপর দু-জনে তারা ফেরে ঘরের দিকে।

কিন্তু সেদিন শোভা নেই। অন্যান্য দিন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে জয়ন্তীর জন্যে। আজ জয়ন্তী দাঁড়িয়ে রইলো। অনেকক্ষণ। ছুটি পাওয়া জনস্রোত চলে গেল তার চার পাশ দিয়ে — শোভার দেখা নেই।

সন্ধ্যে হলো প্রায়।

ভয়ানক খারাপ লাগে জয়ন্তীর। বুঝতে পারে না — এতদিনের সুনির্দিষ্ট নিয়মটা ভাঙলো কেন শোভা। কি হলো তার? মন ক্লান্ত আর ভারাক্রান্ত। ট্রাম ধরলো।

পারুলের খোঁজ নিয়ে যেতে হবে।

সারা পথটা পারুলের কথাই ঘোরাফেরা করে জয়ন্তীর মনে মনে। তার রোগা রোগা মুখটা আর চোখ যক্ষ্মারুগ্নীর ধ্যানী গভীরতা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এতদিন যেন চোখে পড়েনি — অথচ একসঙ্গে কাজ ক'রে আসছে দিনের পর দিন। আজ শুধু চোখে পড়ে তার মূর্ছিত হয়ে পড়াকে কেন্দ্র ক'রে: পারুলের মধ্যে কোথায় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

দু-পাশের উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর ছায়ায় বিকেলের ম্লান আলো মরে আসছে ধীরে ধীরে। সেই মরা আলোর মতো বিলীয়মান বিষণ্ণ অফিসফেরতা মানুষ। গম্ভীর। আশ্চর্য রকম গম্ভীর মুখগুলি সব। তার মাঝখানে পারুলের মুখ। ধ্যানী — বিশীর্ণ। হয়ত তার কোথাও কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে — যার কিছুই জানে না জয়ন্তী, কিছুই জানে না এতগুলি মানুষ। দুনিয়া চলে যাচ্ছে। চলে যাবেও। এইটে বিশ্রী লাগে জয়ন্তীর। বলে সে মনে মনে — কেন যাবে?

তবু যাবে। ট্রাম চল্‌ছে। লোহার পাতে লোহার চাকা কর্‌ কর্‌ ক'রে উঠছে অদ্ভুতভাবে। বিশ্রী শব্দ। বিশ্রী লাগছে জয়ন্তীর। সব কথা সে জানেও না পারুলের। কয়েক মাস আগেও পর্যন্ত সে দেখেছে, মাঝে মাঝে একটি যুবক এসে অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো পারুলের জন্যে। সাধারণ মানুষ — বছর ত্রিশেক বয়েস। সেই সাধারণ লোকটিকে দেখে রঙ বদলে যেত পারুলের মুখে এক অসাধারণভাবে। সেই মুহূর্তে মনে হতো — সারা ডালহৌসী স্কোয়ারের পরিশ্রান্ত বিবর্ণ

বিকৃত মুখগুলির মাঝখানে — এমন কি, মুষ্টিমেয় সুখী বেপরোয়া মুখগুলির মাঝখানেও একটি মুখ সব চেয়ে সুখী — সব চেয়ে উজ্জ্বল — উদ্ভাসিত। সে হলো পারুল — আর সেই যুবকটি। পারুলের কথা ভাবতে ভাবতে অতীত খুঁড়ে এইটুকু শুধু পায় জয়ন্তী।

জিজ্ঞেস করেছিল জয়ন্তী একদিন।

কেউ ছিল না পারুলের ঘরে। তবু জয়ন্তীর প্রশ্নে শঙ্কা ঘন হয়ে উঠেছিল পারুলের চোখেমুখে। কেউ যেন শুনতে পাবে এই ভয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিল :

'চুপ।'—

'মানে ?'—

'সে-কথা এখানে না।'

আর কোনো প্রশ্ন করেনি জয়ন্তী। হয়তো কিছু চেপে যাওয়ার আছে বাড়ীর কাছে। চেপে যাওয়ার ছিলও।

পারুল বলেছিল একদিন, 'সুবোধের কথা জিজ্ঞেস করিস তুই, কিন্তু আমার মা কি বলে জানিস ? বলে — বিয়ে ছাড়াও তো বড় কাজ আছে মেয়েদের। এই যে বোনেদের জন্যে জীবনপাত করছিস — ছেলের মতো খেটেখুটে সংসার চালাচ্ছিস — একি কম কথা। ত্যাগই মানুষকে বড় ক'রে তোলে।'

জয়ন্তী মুখ বিকৃত ক'রে বলেছিল, 'এ সেই বিট্‌লে স্বামীজীগুলোর বুদ্ধি।'

'হয়তো হবে।' পারুল বলেছিল, 'সুবোধ মায়ের কাছে গিয়ে বিয়ের কথা বলেছিল। মা মত দেয়নি। তারপর আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে : আমি চলে গেলে সংসার চালাবে কে ? আমার নাকি লজ্জা করা উচিত।'

পারুলের বাড়ীর এই বদ্ধ পরিবেশটাকে সে জানে — ঘৃণা করে। বাবা

নেই — মারা গেছে। বাড়ীর কর্ত্রী হলো বিধবা মা। তিনি থাকেন, তাঁর এক-কোণঠাসা জীবন নিয়ে। ধর্মগ্রন্থ আর মিশনের স্বামীজী। স্বামীজীরা আসেন প্রায় রোজই — একজন না একজন। তত্ত্বকথা, উপদেশ আর স্তব্ধতা — এই হলো বাড়ীর আবহাওয়া। কোনো কোনোদিন স্বামীজীরা গান ধরেন — শুধু গলায়। তারস্বরে ঈশ্বরের নামগান করেন। সেই সঙ্গে পারুলের ছোটবোনটি মেশায় তার কচি গলা। স্বামীজীরা ভূয়সী প্রশংসা করেন তার। আর একটি বোন বিজ্ঞানের ছাত্রী। সে এ-সবের মধ্যে নেই। পারুলও না। তবু স্বামীজীরা এলে সামনে গিয়ে বসতে হয় তিন বোনকেই। শান্ত গোরুর মতো। মায়ের মতো তিন বোনই শাদা থান পরে। ভাই-টাই নেই। ওই তিনবোন আর মা। বাড়ীটা যেন বিধবার গুমটি। সবটা কেমন মুখ-গোমড়া — অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস। যেতে ভালো লাগে না জয়ন্তীর। তবু যেতে হয় পারুলকে উপলক্ষ্য ক'রে।

ঝিম্ মেরে আছে সারা বাড়ীটা। দোতলার কোন এক ঘরে কর্কশ গলা একটি জলদমন্দ্রস্বরে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে চলেছে। স্বামীজী। যেন গুনে গুনে হাতুড়ীর ঘা মারছে জমাট স্তব্ধতার উপরে — আর জমাট ক'রে তুলেছে ঝিম-মারা পটভূমিকে।

আলো জ্বলেনি পারুলের ঘরে। চুপ ক'রে শুয়ে আছে সে। জয়ন্তী গিয়ে বসলো তার বিছানায়। পারুল তার হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

'কেমন আছিস এখন?' জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলো।

পারুল ম্লান ভাবে হাসলো। বললো, 'মরিনি তো।'—

যেন মরে গেলে ভালো ছিলো — এমনি ভাবে বলে পারুল। অন্তরের থিতানো এক বিষণ্ণতা তার হাসি আর ছোট উত্তরটুকুকে গভীর ক'রে তোলে। জয়ন্তী কোনো কথা বলে না — চুপ ক'রে

বসে থাকে সে পারুলের হাতের মুঠোয় হাত ছেড়ে দিয়ে। পাশের কোন ঘর থেকে ভেসে আসে :

…'আত্মা তাই অবিনশ্বর — চিরজ্যোতিষ্মান। কোনো মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না'…

পারে — পারে। তাকে কলুষিত করতে পারে — তাকে কুরে কুরে খেতে পারে। চিৎকার ক'রে বলে উঠতে ইচ্ছে করে জয়ন্তীর পারুলের বিবর্ণ মুখটার দিকে চেয়ে। ওই দাম্ভিক মিথ্যাবাদীরা জানে না — একটা কিছু গ্রাস করেছে তাকে। জয়ন্তী জানে না ঠিক — তবু আন্দাজ করতে পারে।

'কি হলো তখন তোর ?'

'দেখলিই তো।'

'তা তো দেখলুম। কিন্তু বুঝলুম না কিছু। এও বুঝলুম — আগে এসব ছিল না — এখন হচ্ছে।'

'না — তা ঠিক না।' পারুল সপ্রতিভাবে বললো। 'আজই প্রথম হলো।'—

'হঠাৎ হলো ?'—

চুপ করে গেল পারুল। কি উত্তর দেবে সে ভেবে পেলো না। হঠাৎই যেন হয়ে গেল ব্যাপারটা। চুপ ক'রে ছিল সে, চুরি ক'রে দেখছিল জয়ন্তীর উজ্জীবিত মুখ, শুনছিল কান খাড়া করে তার অশ্রান্ত কথা। তারপর আনমনা হয়ে গিয়েছিল একটু। আনমনা হয়ে গিয়েছিল কোনো-একদিনে। হঠাৎ এমন সময় তুলেছিল জয়ন্তী সুবোধের কথা। একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের আচমকা নাড়ায় বুকটা থরথর ক'রে উঠেছিল পারুলের — হাঁটুর কাছে পা কেঁপে ভেঙে পড়লো। বহুদিনের চাপা আবেগের মুখ একটা খোঁচা মেরে যেন খুলে দিল জয়ন্তী খেলতে খেলতে। জয়ন্তী জানে না অনেক কিছু। অন্য কেউই জানে না পারুলের কথা।

জয়ন্তী বললো, 'আপত্তি থাকলে বলিসনে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে — সুবোধবাবু কোথায় এখন। একসময়ে তো রোজই প্রায় দাঁড়িয়ে থাকতেন অফিস-ছুটির সময়ে।'—

থাকতো। অনেকদিন আগের স্বপ্নের মতো দিনগুলো। আজ নতুন ক'রে যেন ছায়া ফেলে চোখে। শ্রান্ত দিনান্ত উদ্দাম হয়ে উঠতো মনে মনে, হাতে হাতে, শিরায় শিরায়। মায়ের সোজা প্রত্যাখ্যানেব পর সুবোধ আর এ-বাড়ীতে ঢোকেনি কোনোদিন। তবু পারুল তাকে টান মেরেছিল অফিসের দরোজা পর্যন্ত: অফিস ছুটির পব কোনো সস্তা দোকানে দু-কাপ চা খেয়ে চলে যেতো তারা গড়ের মাঠের মাঝখানে। জাল বুনতো কথার — স্বপ্নের, পাথর-চাপা কামনার — আশার। সন্ধ্যার অন্ধকার আড়াল ক'রে দিত তাদের। একটা দুর্জ্ঞেয় রচনার মধ্যে এক হয়ে যেত দুটো হৃদয়। দুটো মানুষ — দুটো মন। মায়ের প্রত্যাখ্যানের পর সুবোধ বিচলিত হয়ে পড়েছিল বড়। বলেছিল:

'আমি ভাবতে পাবছি না। এইভাবে শেষ আমি ভাবতে পারি না।'

'তুমি ভাববে না।' জোব দিযে পারুল বলেছিল, 'তুমি বাসা ঠিক করো — আমি চলে যাব।'

'তোমার মা বোন'—

'তারা যেমন আছে তেমনি থাকবে।'

'চলবে কেমন করে? তোমার রোজগারই তো সম্বল তাঁদের — আর মিশনের কিছু সাহায্য।'

'সাহায্য তো করবো আমি — যা পাই।'

'বোকা।' সুবোধ গাল টিপে আদর করে বলেছিল, 'এদিকে বাসা তো করতে হুকুম দিলে আমাকে — কিন্তু সেটা চলবে কেমন করে? একা আমি চালাতে পারবো কেন?'

বহুক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিল পারুল। তারপর বলেছিল আস্তে আস্তে, 'আমি জানি না। তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?'

'ছিঃ।'

চোখে জল এসে পড়েছিল পারুলের, সুবোধের হাতটাকে কখন অজান্তে চেপে ধরেছিল সে শক্ত করে। সুবোধের দুই হাতের শক্ত বাঁধনের মধ্যে থেকে যেন পরম নির্ভয়ে শুনেছে সে — আছে, পথ আছে। সামনে ধর্মঘট — রুজির লড়াই। জিতলে কিছু মাইনে বাড়বে সুবোধের। তখন বিশ্রী সমস্যাটার সমাধান হতে পারবে একটা।

'তাছাড়া'— সুবোধ বলেছিল, 'গোটা দুই টিউসনী জোটাতে পারি যদি।'—

'টিউসনী আমিও তো করতে পারি।' পারুল সোৎসাহে বলেছিল, 'ধরো সন্ধ্যের দিকে।'

'পারো,' সুবোধ বলেছিল, 'আমিও সকাল সন্ধ্যে দুটো পারি।'

'তুমি সকালে কোরো। সকালটা আমার রাঁধাবাড়া তাড়াহুড়োয় যাবে। সন্ধ্যের দিকটা ঘরে থেকো, আমার একা একা বিশ্রী লাগবে।'

'বাঃ, তুমি যে বললে — সন্ধ্যের দিকে টিউসনী করবে তুমিও।'

'ওমা — তাই তো!'

লজ্জায় মুখ লুকিয়েছিল পারুল। আশা আর আশ্বাস ডানা ঝাপ্‌টেছিল সেদিন গড়ের মাঠের শূন্য অন্ধকারে বাদুড়ের মতো। জয়ন্তীর প্রশ্নের খোঁচায় সুবোধ আর সেই দিনগুলো কেঁপে উঠেছিল পারুলের মনে সুইচবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে।

ওদিকে কঠোর শব্দগুলি ভেসে আসছে পাথর-ভাঙা রূঢ় আঘাতের মতো কোনো একটা ঘর থেকে:

'... বন্ধনের শেষ নাই। প্রিয়জন, ভোগ, সমৃদ্ধি — কত কি! অসংখ্য মায়ার ছদ্মবেশে প্রলোভন সাজানো থরে থরে। বলে ভোগ করো।— এই মিথ্যার মাঝখানে ত্যাগের কঠোর মূর্তিকে ধ্যান করতে হবে।'...

মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা। অসহ্য। গোটা বাড়ীটা যেন চেপে ধরেছে জয়ন্তীকে। সে রুখে বলে উঠলো:

'সুবোধ কোথায় বল?'

'জানিনে।' পারুল বললো ছোট্ট ক'রে।

'মানে?'

'সে গেছে তাদের অফিসের কাজে—কোন্ কলিয়ারীতে। আর ফেরেনি।'

'কত দিন হলো?'

'মাস চারেক। বলে গিয়েছিল, মাত্র দিন চার পাঁচের কাজ।'

বলেছিল সুবোধ, 'ফিরে এসেই আমার এবার লক্ষ্মীলাভ। সময়টা ভালোই যাবে মনে হচ্ছে। ধর্মঘটে জিতলুম, কিছু মাইনেও বাড়লো। অতো ইউনিয়ন লড়াই ক'রেও মালিক বিশেষ কাজের দূত ক'রে পাঠাচ্ছে কলিয়ারীর ম্যানেজারের কাছে।'—পারুলকে আদর করে বলেছিল, 'লক্ষ্মীলাভ'।

এতটুকু সন্দেহের ছায়াপাত হয়নি পারুলের মনে। বলেছিল, 'আর দেরী করো না তুমি।'

'না—আর দেরী না।' সুবোধ বলেছিল, 'আমারও ভাল লাগছে না আর। জানো, বাসা দেখেছি।'

'দেখেছ?' উছলে উঠেছিল পারুল। বলেছিল, 'কোথায়? দেখতে যাব আমি।'

'বস্তির ভেতরে কিন্তু।'

একটু দমে গিয়েছিল পারুল। বলেছিল তবু, 'তা হোক।'

তবু সে এক কল্পনার স্বর্গ।

সুবোধ কিন্তু চিন্তিত। ভেতরের জটপাকানো চিন্তাগুলি মেলে ধরেছিল সে পারুলের কাছে। বলেছিল:

'আমার কিন্তু যেতে ভাল লাগছে না পারুল! মালিক অতবড় একটা বিরোধের পর হঠাৎ কলিয়ারীতে আমাকেই বিশেষ কাজের ভার দিয়ে পাঠাচ্ছে কেন? যদিও শুধু যাওয়া আর আসা, কিন্তু —'

'ভাবছে হয়তো, খুশি ক'রে হাতে রাখা ভালো।'

'তাই কি? তবে ভুল করেছে।' বলে হেসেছিল সুবোধ।

তারপর সে চলে গেছে। চার মাস হলো।

আঁতিপাতি ক'রে খুঁজেছে পারুল — তার অফিসে, তার ইউনিয়নে। সুবোধের সহকর্মীরা খোঁজ ক'রেছে তন্ন তন্ন ক'রে — ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী সে একজন। সহকর্মীরা তার যাওয়ার ব্যাপারটা জানে — কি এক বিশেষ চিঠি নিয়ে যাচ্ছে কলকাতা অফিস থেকে কলিয়ারীতে ম্যানেজারের কাছে। কিন্তু ম্যানেজার জানে না কোন চিঠির কথা — অফিসেও নেই পাঠানো সেই চিঠির রেকর্ড। মাঝখান থেকে একটা লোক শুধু উবে গেল কর্পূরের মতো।

পারুল জিজ্ঞেস করছিল সুবোধের একটি সহকর্মীকে, 'তবে? কোথায় গেল?'

'কি জানি — বেঁচে আছে কি-না। কলিয়ারীর ইউনিয়নও খোঁজ করেছে — খাদে খাদে।'

কত দুর্গম খাদও তো আছে — যেখান থেকে একটি হাড়ের চিহ্নও খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

·· 'ভোগ, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা — কিছু নয়, মায়া। শ্রেয়ের পথে চলো — ত্যাগের সহজ নিরাভরণ রূপটিকে ধ্যান করো — ধ্যান করো মহাত্যাগী ঈশ্বরের। আর সব ঝুটমুট—।'

ঝুটমুট।···

অশ্রান্ত উপদেশ চলেছে কোথায় কোন ঘর ভরে — সারা বাড়ীটা ভরে — এই অন্ধকার ঘরে — পারুলের ওপরে। যেন সারা জগত ভরে।— ঝুটমুট।

জয়ন্তী স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন মুহূর্তের জন্য সেই অভ্রান্ত সুগঠিত কথাগুলির সামনে। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলো মনে মনে। বললো, 'তা হলে? এখন উপায়?'

'আজ মরে গেলে বড ভালো হতো রে জয়ন্তী। তারপর আর কিছু দেখতে আসতুম না — শুনতেও পেতুম না।' পারুল বললে আস্তে আস্তে, 'মা জানে না — বোনেরাও তো জানে না আমার কোনো কথা। কিছু যদি আজ নাও বলি — তবু আমি তো জানবো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, কত বড় অপমান আমি ওদের জন্য বয়ে নিয়ে চলেছি। বিশেষ করে মা যেদিন জানবে — সেই দিনটার কথাই ভাবি শুধু।'

'পারুল!'— কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল জয়ন্তী। অন্ধকারে চেয়ে রইল সে — চোখে আর একটা অন্ধকার নিয়ে — চোখে গভীর জিজ্ঞাসা।

পারুল ফোঁপাচ্ছে আস্তে আস্তে। বললো:

'আমি আর পারছি না। আমাব মবা ভালো জয়ন্তী এ অবস্থায়।'

'কিন্তু সুবোধবাবু তো—'

'না, সে আর নেই। বেশ বুঝেছি। যাওয়াব সময় সে বলেছিল তার সন্দেহের কথা। আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

'সে নিয়ে অনুশোচনা ক'বে তো আব লাভ নেই।'

'জানি জয়ন্তী, কিন্তু আমি যে তার ছেলের মা:— সে কিন্তু চায়নি।'

একটা নির্মম সত্যের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো জয়ন্তী। ঘর ভরা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। পারুল ফোঁপাচ্ছে চেপে চেপে। আর—

'... পাপ তোমাকে টানবে সহস্র পথে, টানবে ষড়রিপু সহস্র পাকে। ঘৃণা ভরে ত্যাগ করতে হবে তাকে।— ত্যাগ করো। এই হলো মহামন্ত্র। মায়া প্রপঞ্চময় এই জগতের জড়জীবনটা নয় — আত্মার মুক্তির জন্যই সর্বস্ব, এই হলো এক লক্ষ্য।'

ঠাণ্ডা শক্ত শক্ত কথাগুলি বেরিয়ে আসছে যেন কোনো অন্ধকার গহ্বর

থেকে। তলিয়ে যাচ্ছে এ বাড়ীর জীর্ণ কাঠামোটার পাকে পাকে — দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও চক্রান্তের সুনিবিড় গভীরতায়। যেখানে গুমরে গুমরে উঠছে পারুলের রুদ্ধশ্বাস চাপা ফোঁপানী।

জীবন একটা মূর্তিমান কান্নার মধ্যে নিরবলম্ব হতাশায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। প্রতিটি শব্দ তার কাঁপছে এ বাড়ীর কোণায় কোণায়। একটি জীবন — কোনো একদিন স্বপ্ন দেখেছিল সে, ভালোবেসেছিল এই জীবনকে, এই পৃথিবীকে।

পারুলকে কোনো আশ্বাসই সে দিয়ে আসতে পারেনি — ঘর-ফিরতি সারা পথটা জয়ন্তীর মনে মনে শুধু এই কথাটিই ঘোরা ফেরা করে। এ এমন একটা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় — পথ রোধ করে সামনে খাড়া হয়ে উঠেছে পাহাড়ের মতো। পথ নেই যেন। মন ভরে যায় অস্বস্তিতে। একটা বলিষ্ঠ স্বপ্নের উচ্ছ্বসিত আশা একেবারে নিঃশেষে উবে গেছে বাষ্পের মতো। বাকী যা পড়ে আছে — ক্লিন্ন তলানী, তা হলো পারুলের কলঙ্কিত জীবনটা। কোথায় লুকোবে সে? কোথায় কোন বস্তির ভেতরে না-দেখা একটা ঘরে মনে মনে সে সংসার পেতে বসেছিল। ছিল সেখানে তার ছেলেমানুষের মতো ছড়ানো ছত্রখান আশা আর আশ্বাস, ছিল সুবোধ। তাকে বাজপাখীর মতো ছোঁ-মেরে নিয়ে চলে গেল কোন কলিয়ারীর মালিক। তার পর? পারুলের জীবন কি শেষ?— মনে মনে শুধোয় জয়ন্তী: না আর একটা মাথা ঠেলা দুরন্ত জীবনের সুরু?

গড়ের মাঠের একান্ত দিয়ে ট্রাম ছুটেছে হু-হু করে। শূন্য অন্ধকারের দিকে জয়ন্তী চেয়ে রইলো। তার নিজের কথা হারিয়ে গেছে কোথায়। মাঠের অন্ধকারে ঘন হয়ে বসা দু-একটি অস্পষ্ট অন্ধকার মূর্তি চোখে পড়ে, এখানে ওখানে দু-একটি চলমান শাদা পোশাকের অস্পষ্ট ছায়া। যেন পারুল আর সুবোধের টুকরো টুকরো অতীত। তারা আসতো-বসতো এখানে

এসে। আর আসবে না। মনে থাকবে — এপথ দিয়ে যত দিন যাবে জয়ন্তী, মনে পড়বে তার। মনে মনে বলে সে।

আস্তে আস্তে তার চিন্তার ধারাগুলি জড়ো হয় তারপর নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে — মনে পড়ে হঠাৎ একটি হিসেবী লোককে। সুধীরকে। এখন তাকে মনে করে কৌতুক বোধ করে না আর জয়ন্তী। বরং কেউ যেন তার ঘাড়ে ধরে সোজা প্রশ্ন করে বসে, সে যদি আসে তার হিসেব-নিকেশ করতে? কি উত্তর দেবে জয়ন্তী? এক লহমায় সামনে ভেসে ওঠে তার ভাই বাসুদেবের মুখ, ছোটবোন বাসন্তীর মুখ, বাবার মুখ, – দারিদ্র্য, দায়-দায়িত্ব। পারুল। এক-একটা বিরাট জিজ্ঞাসার মতো। তার মাঝখানে জবাব খোঁজে।

ট্রাম থামলো চৌরাস্তার এক মোড়ে। অন্যমনে নামলো জয়ন্তী। এগোলো। মোড়ে চারিদিকের ঠেলা ভিড়। এক জায়গায় দানা বেঁধে গেছে কতগুলি লোক — উৎকর্ণ, উদগ্রীব আর গম্ভীর। রেডিও শুনছে। দিল্লীতে এসে পৌছেছে ক্যাবিনেট মিশন – নেতারা অভ্যর্থনা করেছে সাদরে। একঘেয়ে বাজখাঁই গলায় তারই বর্ণনা। স্বাধীনতার আশা ও আশ্বাস।

তার পর? কি রূপান্তর আনবে ভবিষ্যৎ – আজকের দানাবাঁধা ভিড়ের উৎকর্ণ উদগ্রীব মুখগুলির নিঃশব্দ প্রত্যাশা? কি হবে? কি হতে পারে?

শুধু অসহ্য। দুঃসহ। হঠাৎ সবটা কেমন দুঃসহ লাগে জয়ন্তীর — এই বহু পরিচিত শহর, কাজ-ঠেলা ভিড়, সাজানো গোছানো আলো-ঘর-বাড়ি — মেলা। সবটা শুধু অসহ্য মনে হয় তার। সামনের সবকিছুর গভীর অন্তরালে একটা কুৎসিত বিকৃত জীবনের অখণ্ড ধারা এক লহমায় তার চোখের সামনে ঝল্‌কে ওঠে যেন। আশাগুলো মিথ্যে হয়ে যায় এখানে। জীবন যেন রঙীন লেবেল-মারা পুরনো পচা মাংসের কৌটো। এ অসহ্য। বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোলো জয়ন্তী। নির্জন গলির মোড়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

আগে আগে বাসুদেব যাচ্ছে মনে হয়—তারই মতো ঘাড় নিচু করে চলেছে, অন্যমনে—হাতের আস্তিন গুটানো। জয়ন্তী ডাকলো। বাসুদেব দাড়ালো। তাকালো দিদির মুখের দিকে। জয়ন্তী বললো, 'পড়াতে যাসনি আজ?'

'মিটিং ছিল। আমাদের ছাত্রদের।'

'কিসের মিটিং?' জয়ন্তী অন্যমনস্ক।

'নৌবিদ্রোহীদের মুক্তির দাবীতে।' একটু থেমে বাসুদেব বললো, 'দেরাদুনে গুর্খাবাহিনীও বিদ্রোহ করেছে।'

করুক। দেশ জুড়ে করুক। জয়ন্তীর কানে বিদ্রোহ শব্দটা ভালো লাগে হঠাৎ। ভয়ানক ভালো লাগে মার খাওয়া সারাটা দিনের পর। চাপা অস্বস্তিটা পথ পায় যেন এতক্ষণে।—অসহ্য।... জিজ্ঞেস করলো:

'কি হলো মিটিং-এ?'

'কাল শোভাযাত্রা বেরোবে বিদ্রোহীদের সমর্থনে।'

আরো কিছু চাই। কোথায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে যেন। কান খাড়া ক'রে থাকে জয়ন্তী। কিন্তু বাসুদেব চুপ করে গেছে। নীরবে হেঁটে চলেছে পাশাপাশি। হাওয়ায় রেডিওর ঘোষণা:

...পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ক্যাবিনেট মিশনের উদ্দেশে কোথায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।...

বাসুদেবের ক্ষ্যাপা গলা হঠাৎ ফেটে পড়ে চাপা আক্রোশে:

'বিশ্বাসঘাতক! বিদ্রোহীদের জেলে পুরে দিয়ে অভিনন্দন জানাতে গেছে ক্যাবিনেট মিশনকে।'

বাসুদেবের রোগা রোগা, ক্রুদ্ধ মুখটার দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে রইল জয়ন্তী। নীরবে হাঁটতে লাগলো পাশেপাশে। বড় ক্লান্ত লাগছে। আর ভালো লাগছে হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা বাসুদেবের রোগা রোগা মুখটা। ভালো লাগছে হঠাৎ তার পাশে পাশে হাঁটতে। ওই রকম একটা

জলে-ওঠা ক্ষ্যাপামীর অপেক্ষাই করছিল যেন সে—ওই রকম একটা দুরন্ত আশ্বাস-ভরা কণ্ঠের। ক্লান্ত গলায় সে বললো:

'কি হবে — কি-ই বা হতে পারে আর।'—

প্রায় অন্ধকার গলি—বহু দূরে দূরে গ্যাসের বাতি। নির্জন। তার মাঝখানে জয়ন্তীর ক্লান্ত কথাগুলি শোনায় কান্নার মতো। তার সমস্ত বিশ্বাস এবং প্রত্যাশার ওপর ধীরে ধীরে ক্লান্তি নেমে এসে গ্রাস করে ফেলেছে যেন সবটাকে। মেনে নিতেই হবে।

বাসুদেব বলে উঠলো, 'এলাহাবাদ আর দিল্লীর পুলিশ অনশন ধর্মঘট সুরু করেছে।'

'কেন?'

বাসুদেব দিদির হঠাৎ এইরকম প্রশ্নে একটু দমে যায়। মনে মনে যুক্তি খোঁজে তার আবেগের — উচ্ছ্বাসের। বলে উঠলো, 'রুজি-রোজগার আর রেশন — এই সব নিয়ে ধর্মঘট করেছে অবিশ্যি তারা। হলোই বা। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তবু বিদ্রোহ তো করেছে। কেউ চায় না এই ব্যবস্থা। এবার চারদিকে কি সুরু হয় দেখিস।'—

কিছু একটা হবে। কিছু একটা হওয়া উচিৎ। প্রত্যাশার এ এক টলোমলো দিন। উত্তেজনা। রেডিওর সামনে ভিড়। প্রায় দুশো বছরেব এই রাজধানী। দুশো বছরের জমা-হওয়া হাজারো বঞ্চনা ও ব্যর্থতার উত্তরাধিকার আজ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ঘাড় বেঁকিয়ে — বজ্জাত ঘোড়ার মতো: আর নয়। এবার যেন জঞ্জাল সাফ করার দিন। নৌবিদ্রোহীর সশস্ত্র প্রতিরোধে, আজাদ হিন্দ বন্দী নেতাদের মুক্তি আন্দোলনে টলোমল করে উঠেছে মধ্যবিত্তের এই রাজধানী বারে বারে — আশ্বাস খুঁজেছে পুরুষানুক্রমিক ব্যর্থতার, হতাশার। কখনো মার খাওয়া মুখে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়েছে সাগরপারের রাজার দেশের দিকে — কি কথা হয় সেখানে, কি দেবে ক্যাবিনেট মিশন।

জগন্নাথ। চলতে সুরু করেছে—যে দিকে পথ পায়। হ্যাঁ—টলোমলো দিন। অনিশ্চিত—অস্থির।

সেই অস্থিরতা প্রত্যাশায়—অনিশ্চয়তা জয়ন্তীর কথায়ঃ

'কি হবে—কি হতে পারে!'…

বাসুদেব চুপ ক'রে গেছে—হাঁটছে ঘাড় নিচু ক'রে।

এবার বাড়ী। ঘরে ঢুকলো।

বাসন্তী বাসুদেবের মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'বলি এবার দিদিকে?'

বাসুদেব অত্যন্ত কাতর ভাবে তাকালো জয়ন্তীর দিকে।

বাসন্তীর মুখে চোখে শাসানী।

জয়ন্তী বাসুদেবের অপরাধী মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'কিরে বাসু—কি করেছিস?'

'ছোড়দা এমন হ্যাংলা দিদি,' বাসন্তী বলে উঠলো, 'আজ বিকেলে চা খাওয়ার সময় চেপে বসলো গিয়ে কাকীমার ঘরে। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। এত চোখ টিপলুম—'

চোখ টিপে ইসারা করে বহুবার ডেকেছে বাসন্তী—কাকীমা তখন তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে রুটিতে জ্যাম মাখাচ্ছেন। বাসুদেব শুধু চায়ে চুমুক দিয়ে সামনে চেপে বসে কি-না বলে বসলঃ

'আমাকে এক পিস দাও না কাকীমা।

কিন্তু এ বাড়ীর নিয়ম এ নয়। দু-ভাইয়ের একান্নবর্তী সংসার বটে কিন্তু কতগুলো ব্যাপার আছে যে যার শরিকের। তার মধ্যে চা ও সকাল বিকেলের জলখাবার একটি। ছোট শরিক বড় চাকুরে—তাঁর ছেলেমেয়ের তদ্বির-তোয়াজও তেমনি। এটা হয় যে-যার ঘরে বসে। বড় শরিক জয়ন্তীর বাবা, একষট্টি বছরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়ো মানুষ। বিশ বছর বয়সে এক সদাগরী অফিসে কেরানি হয়ে ঢুকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে বেরোলেন ডানদিকের পক্ষাঘাত নিয়ে—কোনো পেনসন নেই,

জমার খাতায় শুধু বছরের পর বছর জীবনধারণের খরচার হিসেব। এক আশ্বাস — বড মেয়ে জয়ন্তী চাকরী করে, বাসুদেব পড়ে আর পডায। ভাই-বোনে যা পায় এনে জমা দেয় কাকীমার হাতে। তিনিই কর্ত্রী।

জয়ন্তীর ক্লান্ত মুখটা বড বিষণ্ণ দেখায় হঠাৎ। বেদনাহত। বাসুদেব সেদিকে আর তাকাতে পারে না। মুখ নিচু করলো।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলো, 'কাকীমা কি বললো?'

'কি আর বলবে।' বাসন্তী বললো, 'মুখ গোমডা করে ছুঁডে দিল এক পিস রুটি। উনিও খেতে লাগলেন।' –

'ক্ষিদে পাচ্ছিল দিদি।' সপ্রতিভ ভাবে বাসুদেব একবার তাকালো জয়ন্তীর মুখের দিকে। তার পর চোখ নামিয়ে বললো, 'তাছাড়া মিটিংয়ে যাব বলে তোর জন্যে আর অপেক্ষা করিনি।' –

জয়ন্তী আর কিছু বলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাপড ছাডতে চলে গেল।

বাসুদেব রুখে উঠলো এবার বাসন্তীর ওপরে, 'ভারী হয়ে তুই। যতো তোর পেটিবুর্জোয়া সব ন্যাকামী, ক্ষিদে পাচ্ছিল – তাই খেলুম।'

'বেশ। দিদি আসুক – বলছি আবার।' বাসন্তী শাসালো।

'যা – বল গে।' -

বাসুদেব পালালো পডার ঘরে। সামনে পরীক্ষা – পডার ঘর তার তেতলার চিলকোঠায়। বড একটা কেউ সেদিক মাডায় না।

'বাসন্তী।' –

পাশের ঘরে বাবার গলা। সব কথা শুনেছেন বাসন্তীর। বাসন্তী পাশের ঘরে ঢুকলো।

ভবদেব শুয়ে আছেন কাৎ হয়ে। তাঁর ছ-বছরের শয্যা।

'জয়ন্তী এলো – না রে?' ভেঙে-পডা মানুষের নিরুপায় আর্তনাদের মতো তাঁর গলা।

'দিদি এই এলো। – ডেকে দেবো ?'

'থাক থাক – পরে ডাকিস।' ভবদেব বললেন, 'তুই বোস এসে।'

বাসন্তী বসলো বিছানাব এক পাশে।

ভবদেবেব মুখ কাচুমাচু। জানাব কৌতূহল একটা চাপছেন প্রাণপণে। পাবলেন না। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস কবলেন :

'হ্যাঁবে, তোব কাকীমা কি কিছু বলেছেন ?'

'ছোড়দাব ব্যাপারে তো ?' বাসন্তী ঠোঁট উল্টে বললো, 'মনে মনে কি আব না বলেছেন ভাবো। ছোড়দাটাব যে কবে আক্কেল হবে।' –

আদ্যোপান্ত আবাব বলে যায় বাসন্তী। ভবদেব শোনেন চুপ ক'বে। বোগা বুড়োটে মুখটা আরও চুপসে বিবর্ণ হয়ে যায়।

কথাব মাঝখানে এসে দাঁড়ালো জয়ন্তী। মুখটা থমথমে গম্ভীর। বাসন্তী থেমে যায আপনি। দিদিব এই নিঃশব্দ ভাবান্তবগুলো তার অত্যন্ত চেনা - বুঝতে পাবে কোথাও কোনো অন্যায় হচ্ছে কি হচ্ছে না। বোঝেন ভবদেবও। মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। ধবা-পড়া অপরাধীব মতো বলে উঠলেন :

'বাস্তব পাগলামী শুনছিলাম। একেবাবে পাগল বুঝলি' — বলে জোব করে একটু হাসবাব চেষ্টা কবলেন তিনি। কিন্তু ভালো কবে পারলেন না।

জয়ন্তী বাবাব মাথার কাছে বসে পড়ে বললো, 'পাগল কেন হতে যাবে বাবা, ক্ষিদেই পেয়েছিল ওব।'

ভবদেবের মুখটাকে মুহূর্তে মনে হয় চাবুক খাওয়া। অসহায়ের মতো চেয়ে থাকেন বড মেয়েব মুখেব দিকে।

হঠাৎ বাসন্তী উৎসাহিত হয়ে ওঠে আবাব। কথাব ধারা তার স্বপক্ষে চলেছে। বলে উঠলো, 'আর একদিনের ব্যাপার জানো দিদি ? বলি শোন।— থাম, দেখি কেউ আবার দাঁড়িযে আছেন কি-না।'

জয়ন্তীর বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে সবটাকে চাপা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন ভবদেব। সবটাকে হাসি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেন, 'না না — শুনবে আবাব কে ! কি যে বলিস'—

'তুমি জানো না বাবা।' বাসন্তী বললো, 'কাকীমাকে কত দিন দেখেছি আড়ি পেতে শুনতে।'—

বাসন্তীব কচি অপরিণত মুখটাকে এত পাকা পাকা মনে হয় সেই মুহূর্তে —। কেমন বিশ্রী লাগে জয়ন্তীর। বয়স তার ষোল এখনো পুরেনি। তবুও জয়ন্তী যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, এ-বাড়ীর চাপা চাপা অব্যক্ত কুটিলতা টেনে নিয়েছে ওকে তার কুটিলস্রোতে। জয়ন্তী বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'দেখতে হবে না। বোস তুই।' একটু থেমে আবার বললো, 'ফিরতে দেবি হয়ে গেল আজ একটু — তাই'—

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ভবদেব। কথার ধারা পালটাবাব জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বড্ড দেরী হয়ে গেল আজ তোর।'

জয়ন্তী অন্যমনে বললো, 'সুইচবোডে কাজ করতে কবতে আমাব পাশের মেয়েটি হঠাৎ ফিট হয়ে পড়ে গেল। তাই, তাকে একবার দেখেও এলাম তাব বাড়ী থেকে।'—

'আমারও ওইবকম হয়েছিল।' ভবদেব কথায় কথায় তাঁর পুরানো কথা পাড়েন — পাড়তে ভালোবাসেন। ওই যেন তাঁর শেষ সম্বল। প্রাণ ভরে খরচ করেন। বললেন, 'ওই রকম — কাজ করছি — করতে করতে বাস, চেয়ার থেকে পড়ে গেলাম।'

একত্রিশ বছব ধরে একনাগাড়ে কেরানীগিবি করতে করতে একদিন চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন ভবদেব। আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি কোনদিন। আক্ষেপ করেন — সুযোগ পেলেই বলেন তাঁর কালের কথা, অফিস-বন্ধুদের কথা, ভালোমন্দ সাহেবদের কথা। কিন্তু আজ আর সে-সব কথা বড একটা ওঠে না। সমস্ত আজেবাজে কথায়

অন্তরালে আঘাত-খাওয়া দরিদ্র অসহায় মন একটি মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে বারে বারে। নিঃসঙ্গ বার্ধক্যে স্ত্রীর কথা এসে পড়ে ঘুরে ফিরে। স্ত্রীর কথার মধ্যে খোঁজেন যেন তাঁর আঘাত-খাওয়া মনের সহমর্মিতা, সঙ্গ। বলেন আর প্রায়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন — সে ছিল আলাদা ধরণের মানুষ।'

গ্রামের মেয়ে --- পুরানো সমাজ ব্যবস্থার, একান্নবর্তী সংসারের মানসিক এক গঠন নিয়ে শহরে এসেছিল স্বামীর ঘর করতে — সাহেব বেণের শহর — শিল্প-কারখানার এই শহরে। এর রাজপথ রেল-বন্দর, নতুন নতুন বিত্তবান মালিকের উঁচু উঁচু বাড়ী তখন গড়ে উঠছে গ্রাম ভেঙে ভেঙে। তবু এই শহরে এসে পারিবারিক কাঠামোয় ভবদেবের স্ত্রী বজায় রেখেছিলেন তাঁর ফেলে-আসা পুরাতন গ্রাম-গোষ্ঠীর ধারা — সামন্ততান্ত্রিক ঠাট। কিন্তু ছোট ভাইয়ের স্ত্রী কমলা কারখানা-শহরের মেয়ে। মন থেকে তার সামন্ত-তান্ত্রিক ঠাট মুছে গেছে --- প্রয়োজন করে তুলেছে তাকে একচোখো, ব্যক্তিত্ববাদী। অবসর কোথায় অন্যের দিকে তাকাবার? সঙ্গতি কোথায় কালের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে অন্যের অভাব পুরণ করার? স্বামী বেশী মাইনে পায় সত্যি।— তেমনি আছে একালের নবীন সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার খাই। রুচি, শিক্ষা, সামাজিকতা — সভ্যতা। যে পারলো সে এগোলো। যে পারলো না — সে নামলো। এ যেন ঘোড়দৌড় — বাজী ধরেছে এক-একটা পরিবারকে পরিবার, ব্যক্তির জীবন।

কমলা তাই নতুন এক নাগরিক সভ্যতায় গড়ে ওঠা বাঁকাচোরা অসম্পূর্ণ মানুষ — অসম্পূর্ণ মানুষ ভবদেব এবং তার ছেলেমেয়েও। প্রকাশ্য না হলেও দৈনন্দিন এক মানসিক সংঘাতের মাঝখানে একই ছাদের তলায় দিন কাটিয়ে যায় অপূর্ব এই একান্নবর্তী পরিবারটি। গঠনে এরা সবাই স্বতন্ত্র - - এক-একটি বিকৃত ব্যক্তি। তবু পরিবার হিসাবে যেন গায়ে দেগে রাখে সামন্ততান্ত্রিক পুরাতন ভেঙে যাওয়া জীবনের অত্যন্ত মলিন একটা জন্মচিহ্ন। আর সর্বত্র জীবন থেকে জীবনে, মানুষ থেকে মানুষে, একটা অসম্পূর্ণতা থেকে আর

একটা অসম্পূর্ণতার মাঝখানে যা জ্বলে জ্বলে উঠতে থাকে তা হলো আফশোষ, ঈর্ষা— হতাশা।

ভবদেব শুয়ে শুয়ে পেশেন্স খেলেন আর আফশোষ করেন। বাসন্তীর কচি মন ঈর্ষায় ষাট বছরের সম্ভোগবিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ বুড়ীকেও হার মানায়। জয়ন্তীর মনে আশা আর হতাশার রোদ-বৃষ্টির খেলা। বাসুদেব যেন অন্যরকম। এ বাড়ির ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্য, হাসি আর নিঃশব্দ কান্না - কোনোটাই যেন স্পর্শ করে না তাকে। আদরও না, লাঞ্ছনাও না। অভিজ্ঞ প্রৌঢ়ত্বের অসীম ধৈর্য এবং গাম্ভীর্য নিয়ে থাকে সে চিলকোঠার ছোট কুঠুরিটায়। সে যেন বহন করছে ভবদেবের শেষজীবনের নির্মম কঠোরতা। আর বাসন্তী হলো তাঁর অবদমিত বাসনার বহু ব্যর্থ আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্লেদ।

এত পার্থক্য ও সংঘাতের মাঝখানেও পরিবারের সবাই হাসে, কথা কয় — দিন-গুজরান করে। এই নিয়ম। জ্যাম-মাখা এক টুকরো রুটি নিয়ে কোথাও কিছু হয়েছে — তার কোনো আভাস কোথাও নেই। ছেলে-মেয়েরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে, ভবদেব নতুন দফায় পেশেন্স-এর তাশ পেড়ে বসেন। ছোট কর্তা বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় বেরিয়ে যান। জয়ন্তী যায় কাকীমাকে ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করতে। না, কোথাও কিছু হয়নি। মনে হয় মনের একটু কাণাও ভাঙেনি কোথাও।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় ঘড়ি ধরে দশটায়। কমলা এ-সম্বন্ধে হুঁসিয়ার। কড়া নজর তার সর্বত্র — মায় কয়লা, ইলেকট্রিক পর্যন্ত। কিন্তু বাসুদেব যেন সব আইন ভেঙে দেবে তার। খাওয়া-দাওয়ার শেষে অবলীলায় বলে বসলো :

'আজ বারোটা পর্যন্ত পড়বো কাকীমা? মানে · সামনে পরীক্ষা।'

এগারোটার পর আলো জ্বালার নিয়ম নেই। কিন্তু বাসুদেব বলে বসলো

কি-না আইন ভাঙার কথা। আর, আজকেই ঘটে যাওয়া একটা কাণ্ডের পর ৳ বাসন্তীর চোখ কুটিল হয়ে উঠেছে — কপাল গেছে কুঁচকে।

কমলা বললো, 'পোড়ো।' তারপর আত্মগতভাবেই যেন বললো, 'গেল মাসে একটাকা বেশি উঠেছে চার্জ।'

বাসুদেব সে মৃদুগুঞ্জন শোনার আগেই চটির শব্দ ক'রে উঠে চলে গেছে ওপরে।

নিজেদের ঘরে এসে বাসন্তী দিদির মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'শুনলে তো দিদি!'

'তুই চুপ কর। ঘুমো এখন।'

ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে জয়ন্তীর। চোখ বুজলো। ঘর অন্ধকার। আশ্চর্য ঠাণ্ডা লাগে চোখে। কিন্তু ঘুম ধরে না। অসংখ্য এলোমেলো কথা ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে, ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। পারুল সুবোধ স্বামীজি সুধীর ··· বাসুদেব। বাসন্তী ঘুমিয়ে গেছে কখন পাশে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে তার ওপরে। সারাদিন যুদ্ধ ক'রে শেষ মাটি নিয়েছে যেন। হেরে মরে গেছে। একপাশে সরে এলো জয়ন্তী। উঠলো, বসলো আবার শুয়ে পড়লো। ঘুম আসছে না। বারোটা বাজলো, একটা - দুটো। উঠলো আবার। সারা বাড়িটা ঘুমোচ্ছে অন্ধকারে। নাক ডাকছে একটা — দুটো — তিনটে। একটা ইঁদুরের চলে যাওয়ার নরম শব্দ। কাকীমার ঘরে পাখার হাওয়া-কাটা নরম সাঁই সাঁই। অশ্রান্ত টক টক টক। ঘড়িটা চলছে।

সন্তর্পণে দরোজা খুলে বেরুলো বাথরুমের দিকে।

ওই দেখ, বাসু আলো জেলে রেখেছে এখনও! হঠাৎ ভয় পায় জয়ন্তী। কাকীমার ঘুমন্ত ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে পা টিপে টিপে ওঠে সে সিঁড়িতে। তেতলা। চিলকোঠা।

আলোটা নিভে গেল। শব্দ হলো সুইচের।

'এখনও ঘুমোসনি বাসু ?'

চাপা মৃদু কণ্ঠ জয়ন্তীর, বাসু জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে আছে সে দরোজার আড়ালে।

'বাসু !'

একটা দমকা হাওয়া এসে কোথায় কি সব উড়িয়ে দিল যেন। কাগজের খস্ খস্ শব্দ।

সুইচ হাতড়ে আলো জ্বালালো জয়ন্তী। বাসুদেব দাঁড়িয়ে আছে দরোজার এক পাশে অপরাধীর মতো। দমকা হাওয়ায় ওড়া ঘরময় ছড়ানো পোস্টার — লালকালি নীলকালি : ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আপোস গোলামী বন্ধ কর। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। স্লোগান ছড়ানো সারা ঘর। কালির ঘন রং লেগেছে বাসুদেবের আঙুলে।

ভয় পাওয়া চোখে দিদির দিকে চেয়ে আছে বাসুদেব। ওর রুগ্ন করুণ কচি মুখটার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ বড় সকরুণ লাগে জয়ন্তীর। বেচারী ! ··· গোটা সান্ধ্যটার কথা মনে পড়ে যায় — বাসুদেবের ক্রোধ, তার নিজের ক্লান্তি আর সন্তানসম্ভবা পারুলের অসহায়তা। আস্তে আস্তে জয়ন্তী বললো, 'এই তোর পরীক্ষা !' —— গলায় আর্দ্রতা জয়ন্তীর।

'কাল প্রোশেসন বেরুবে দিদি।' কাকুতি তার গলায়। বললো, 'আজ এগুলো শেষ করে রাখতেই হবে। কাকীমাকে বলিসনি দিদি।'

'কাকীমা জানতে পারলে কেটে দু-খানা ক'রে ফেলবে যে রে।' জয়ন্তী চাপা আতঙ্কে বললো, 'কাকাবাবুর সরকারী চাকরি খেয়াল আছে ?'

বাসুদেব বিব্রত হেসে বললো, 'কাকাবাবু জানে সব।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না জয়ন্তী। বললো, 'কি বললি !'

'কাকাবাবু সব জানে। আর কেউ জানতে পারবে না বলেই তো কাকীমাকে বলে চিলকোঠার ঘরটা দিয়েছে আমাকে।'

'কাকীমা জানে ?'

'না।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জয়ন্তী বাসুদেবের দিকে। বড্ড রোগা রোগা লাগে বাসুকে। তবু তার বসা গালে, চৌকো মুখটায় কেমন একটা চাপা চাপা নির্মম দৃঢ়তা। নির্ভীক পৌরুষ। গত সন্ধ্যায় এই মুখের দিকে চেয়ে সে আশ্বাস খুঁজেছিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো জয়ন্তী। বললো : 'শেষ হয়ে গেছে কাজ ?'

'না। আরও কখানা বাকী আছে।'

'দে আমাকে। তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দি। তারপর ঘুমো।' জয়ন্তী বললো, 'ওই পুব দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দে। আলো দেখতে পাবে কাকীমা।' বলে সে নিজেই জানালাটা বন্ধ ক'রে দিল। তার পর বেড-কভারটা টেনে ঢাকা দিয়ে দিল তার ওপরে।

'বল — কি লিখতে হবে। তাড়াতাড়ি।'

বাসু বোকা বোকা ভাবে বললো, 'তুই লিখবি দিদি ?'

'হ্যাঁ — দে, তাড়াতাড়ি। কাকীমা জানতে পারলে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে।'—

কলম নিয়ে উবু হয়ে বসলো জয়ন্তী।

আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পোস্টার লেখা শেষ হয়ে গেল।

জয়ন্তী ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'যা — এবার শুয়ে পড় আলো নিভিয়ে। কাকীমা জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না।'

বাসুদেব পোস্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললো, 'তোর হাতের লেখাগুলো ভালো হয়েছে দিদি। এবার থেকে ডাকবো তোকে — লিখে দিবি ?'

'দেবো দেবো — ঘুমো এখন।' জয়ন্তী পোস্টারগুলো ভাজ করে রেখে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'শো দেখি -- আলো নেভাই।'

শুয়ে পড়েছে বাসুদেব। আড়মোড়া ভেঙে বললো, 'মাথা গরম হয়ে আছে রে দিদি — ঘুম কি ধরবে? ভোরে উঠে যেতে হবে আবার পোস্টারগুলো নিয়ে।'

'মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি — ঘুমো তুই।'

জয়ন্তী বসলো বাসুর মাথার কাছে। ভাল লাগছে তার। সেই সন্ধ্যে থেকে ইচ্ছে হয়েছে তার — বাসুকে একটু আদর করতে। এমন ইচ্ছে কোনো দিন হয়নি তার। বাইরের আঘাত সংঘাতের জগত আজকে ঠেলে তাকে যেন ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছে। জড়িয়ে যেতে চায় সে কোথাও — কোনোখানে, একান্ত অন্তরঙ্গের কাছে।

'বাসু!' — জয়ন্তী কিছুক্ষণ বাদে নিজেই কথা বলে উঠলো।

বাসুদেব ঘুমোয়নি। সাড়া দিল।

'তোর পরীক্ষার কত দিন বাকী আর রে?'

'মাস দুই।'

জয়ন্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'তোর টিউশনীটা ছেড়ে দে এবার পরীক্ষার অসুবিধে হবে।'

'অতগুলো টাকা — বন্ধ হয়ে যাবে যে দিদি।

'আমি একটা টিউশনী জুটিয়ে নেব।'

'করবি কখন?' বাসুদেব মুখ তুলে বললো, 'সারাদিন ওই কাজের পর সন্ধ্যেবেলা টিউশনী করে পারবি?'

'কটা মাস তো — পারবো।'

বাসুদেব আর কোনো কথা বলে না। জয়ন্তীও না। শুধু নীরবে সে হাত বুলিয়ে যায় বাসুদেবের মাথায়। বহুক্ষণ কেটে যায় এমনি। জয়ন্তী মনে মনে তলিয়ে যায় তার গোপন মনের অসংখ্য আশায় — স্বপ্নে, ব্যর্থতায়।

এক সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, 'এখান থেকে চলে যাবি বাসু — চল পালাই।'

সে-কথার কোনো জবাব পেল না জয়ন্তী। ঘুমিয়ে পড়েছে বাসুদেব। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সুস্থ বিলম্বিত নিশ্বাস।

জয়ন্তী সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়ালো। কলকাতার ময়লা তারা-ভরা আকাশের মিনমিনে আলোয় অদ্ভুত রহস্যময় লাগে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো। মাচের প্রশান্ত ঠাণ্ডা রাত। কোথায় যেন একটি ছেলে কাঁদলো। ঢং ঢং ঢং -- তিনটে বাজলো কাদের ঘড়িতে। সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে আছে আজ জয়ন্তীর -- সূক্ষ্মতম শব্দটিও তরঙ্গ তুলছে চেতনায়। আজ ক্লান্তি নেই — অবসন্নতা নেই। উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রী এক জায়গায় এসে জমাট বেঁধে গেছে।— দারিদ্র্য ··· দায় ··· দায়িত্ব -- তার জীবন।

চারটে। আকাশে আলোর রং ফিরছে ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বহুদূর থেকে জাহাজের ভোঁ ভেসে আসছে। গঙ্গার জলো আমেজ কাঁপছে মার্চের দক্ষিণা হাওয়ায়। আলো-আঁধারির অস্পষ্টতা থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে উঁচু-নিচু বাড়ির ঠাসাঠাসি ভিড়। এলোমেলো — রুক্ষ, পরস্পরের দিকে যেন উদ্যত। সবাই মাথা উঁচু করে উঠেছে বাঁকাচোরা লম্বা তিনকোণা জায়গার সংকীর্ণ সীমান্ত জুড়ে। এই কলকাতা। এত অনাত্মীয় মনে হয় এই মুহূর্তে! ছাদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সবটা এত রুক্ষ লাগে — এত স্থূল আর বিকৃত। সামনে যেন ভাঙা তোবড়া টোলধরা ক্যানেস্তারা টিনের পাহাড় একটাকে ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছে কে। এর মাঝখানে পারুল বলে একটি মেয়ে স্বপ্ন দেখেছিল সুন্দর কোনো জীবনের, পৃথিবী একদিন সুন্দর লেগেছিল তার চোখে। জয়ন্তীরও লেগেছিল। জয়ন্তীও স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল জীবনের — আর পৃথিবীর, যার সঙ্গে সমুখের প্রসারিত ও স্থূল রুক্ষ শহরটার কোনো মিল নেই। এখনও সে সেই কথা ভাবছে : কোনো অনাগত জীবনের।

হয়তো সে নতুন কোনো শহরে — সেখানে নতুন কোনো জীবন। কি সে? সে কেমন? ভাবতে তোলপাড় করে ওঠে কেন বুক! কোনো

পুরুষ? সুধীর? সে তো অবিশ্বাসী! সে কি দেবে তাকে সেই জীবন — যার স্বপ্ন সে বহুদিন দেখেছে আর ভালো বেসেছে?

কিন্তু তার দায় আর দায়িত্ব?

চোখ গিয়ে পড়ে জয়ন্তীর — বাসুর ঘরের দিকে। দুটি জিনিস ঝলকে ওঠে পাশাপাশি। বাসুর ঘুমন্ত মুখ। আর লাল কালির পোস্টার একটা — তখনও লুটোচ্ছে মেঝেতে:

… ইনকিলাব জিন্দাবাদ …

… বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক …

— মা গো! তবু থেকে গেছে একটা। ভাঁজ করে রাখা হয়নি। জয়ন্তী এগলো বাসুর ঘরের দিকে। বাসু ঘুমোচ্ছে অঘোরে। নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে তার রোগা রোগা গাল-বসা চৌকো মুখটা এত সজীব — এত প্রশান্ত মনে হয়। প্রথম মার্চের ভোরের আকাশের মতো — শিশু সুলভ। আরো রোগা রোগা আঙুলগুলোয় লাল নীল কালো কালির দাগ — সেখানে ভোরের আকাশের রং ফেরার ইংগিত।

মুহূর্তে মনে হয় — আশা আছে। জীবন আছে। আছে বিশ্বাস। যতো বিস্মৃত শপথ — সবগুলো কঠোর তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। জয়ন্তী ডাকলো:

'বাসু!'

'উঁ।'

'কোথায় যাবি বলছিলি যে! পাচটা বাজলো।'

তারপর আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল জয়ন্তী।

মাত্র আধঘণ্টা। তারই মধ্যে এসপ্লানেডের এক চা-খানার কেবিনে বসে চুকেবুকে গেল সুধীরের হিসেবনিকেশ। তার এতদিনের বহু জটিল হিসেব — বহু ভাবিত, বহু দোলায়িত। শেষপর্যন্ত মিটে গেল। মাধুরীর

অপ্রত্যাশিত কান্না কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল তাকে। মনে মনে ঠিক করে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে — ছুটির পর জয়ন্তীকে ধরবে সে অফিসের সামনে, হিসেব আজ মেটাবেই। মিটে গেল। তারপর দু-জনেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো রেস্তোরাঁর বাইরে এসে। মাত্র আধঘণ্টা। তবু অসহ্য গুমোটে কেটেছে যেন দু-জনেরই।

এসপ্লানেডের ট্রাম স্টপেজে এসে জয়ন্তীকে ট্রামে তুলে দিল সুধীর। নিজে উঠলো না।

জয়ন্তী বললো, 'আপনি যাবেন না ?'

সুধীর বললো, 'আমার একটু কাজ আছে — সেরে যাবো। তুমি যাও।'

জয়ন্তী আর কোনো অনুরোধ করলো না। তবু বিদায় নেবার মুহূর্তে সবটাকে সহজ ও সাবলীল করে তোলার জন্যেই যেন সে তার গম্ভীর চৌকো মুখে একটু সস্মিত হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করলো। জোর করেই। চৌকো চিবুকের দৃঢ়তার আভাস — যেটা তার মুখেচোখে আর সমস্ত ভঙ্গীতে এনে দেয় চাপা এক বলিষ্ঠতা — সবটাকে মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত করুণ মনে হয় আজ।

ট্রাম ছেড়ে দিল।

সুধীর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এসপ্লানেড গুমটির চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ ভীড়। গতিময় — সংঘাতসংকুল। ফেরিওয়ালার চিৎকার। টুকরো টুকরো কথার মিলিত গুঞ্জন — রূঢ, কর্কশ। পুবদিকে হোটেল-বার, অর্কেস্ট্রা, দোকানদারী ভীড : কড়া বিদ্যুতের আলো — নিয়ন-সাইন। বিজ্ঞাপন। প্রচার। সবটা আলোয় আলো — লাল, নীল, সবুজ। সবটা ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে এসপ্লানেড গুমটির চারিদিকে। এরই মাঝখানে গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে এসে ঢুকেছে পশ্চিম দিকের অন্ধকার — কার্জন পার্কের ঠাণ্ডা সন্ধ্যে, ছুটির পর অফিস কোয়ার্টারের নিঃশব্দ অন্ধকার। এর কোনোটাই স্পর্শ করে না সুধীরকে।

কয়েক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে — নিরুদ্দেশ, কর্মহীন। নিতান্ত একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার তাকে যেন চমকে দিয়েছে — থমকে দিয়েছে।

হ্যাঁ, হিসেব মিটে গেল জয়ন্তীর সঙ্গে। মাধুরীর মুখটা মনে পড়ে যায় শুধু তার — কান্নায় ফোঁপানো, বেদনায় চিবানো। মানুষ কাঁদে কেন? কাঁদে কেন মাধুরী? অদ্ভুত লাগে সুধীরের। বেচারী মাধুরী — এইটুকু কথাই শুধু মনে হয় তার। সুধীর এগোলো।

এসপ্লানেডের ট্রাম স্টপেজ ছেড়ে ধর্মতলার মোড। চলমান জনতার ভীড় ঠেলা মারছে তাকে পেছনে, সামনে — দু-পাশে। মনে পড়ছে মাধুরীর কথা। আজ অফিস বেরুবার মুখে রুখে এসেছিল সে:

'ব্যাপারখানা কি সুধীরদা! হিসেব-নিকেশ আপনার মিটবে?'

'মিটবে মিটবে — থামো।' সুধীর তাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল।

'কবে? আমাকে পরিস্কার করে বলুন। একটা ছোট্ট ব্যাপারকে এমন ক'রে ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন?'

'ছোট্ট ব'লো না — তবে হ্যাঁ — আমার হিসেবটা বড় একচোখো মাধুরী। ঘাটতিটাই তার বড়।' সুধীর বলেছিল, 'তাড়াহুড়োর ব্যাপার না — এ বড় জটিল হিসেব মাধুরী।'

'কিচ্ছু জটিল না।' মাধুরী রুখে উঠেছিল, 'আপনি মেলাতে না পারেন — সরে দাঁড়ান। আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।'

'হিসেবটা আমার মাধুরী — সেটা আমারই থাক। তুমি ছটফট করো কেন? তোমার কি?'

'আমার?' বলে ম্লান হেসে থেমে গিয়েছিল মাধুরী। হঠাৎ মার খাওয়া একটা বিবর্ণ মুখ মনে পড়ছে সুধীরের। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, 'না — আমার আর কি! আমার কিছু না। আমার সব হিসেব মিলে গেছে। ঠিকই তো, আমার আর কি?'

বলতে বলতে অদ্ভুত এক ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে সুধীরের সামনে থেকে চলে গিয়েছিল মাধুরী। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করেছিল বালিশে মুখ গুঁজে।

পেছন থেকে সুধীর বলেছিল, 'সত্যি, তুমি বড় বোকা মাধুরী।'— মনে মনে বলেছিল, গেঁয়ো গোবেচারী এই স্ত্রীজাতটাকে পালিস জেল্লার বেনেতি সভ্যতা এখনও ধ্বংস করতে পারে নি — হে ঈশ্বর, এদের রক্ষা করো না! তারপর মুখ ফুটে বলেছিল, 'পরের বিয়ের জন্যে অমন কান্নাকাটি — আমার কেমন মায়া হচ্ছে মাধুরী নিজেরই ওপর। করুণা হচ্ছে। সত্যি — তুমি আমার মস্ত ··· মস্ত — কি বলবো, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী।'

'প্যারিস পিকচার — প্যারিস পিকচার। বহুৎ গরম হ্যায় বাবু — রূপেয়ামে ছেঠো।' পেছনের অন্ধকার গলিমুখ থেকে একটি ছোকরা বলে উঠলো সুধীরের পেছনে — চাপা গলায়। তারপর হটে গেল সে পাথরের মতো ঠাণ্ডা চোখ, রোগা রোগা মুখ একটা অভিব্যক্তিহীন মূর্তির কাছ থেকে।

মাধুরী হঠাৎ ফুঁপিয়ে বলে উঠেছিল, 'আপনি যান। আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। কোনোরকমে বাঁচতে চেয়েছিলাম। হলো না। আপনি দূরের মানুষ — দূরেই থাকুন। বেশ ছিলাম আমি বরং ভাগ্যকে মেনে নিয়ে।'

সুধীর হঠাৎ চমকে গেছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এ যেন অন্য কারুর কথা — হ্যাঁ, অন্য এক মাধুরীর কথা — চাবুক খাওয়া আর্তনাদ। ঘা-খাওয়া বুড়ো অভিজ্ঞ মানুষের মতো জীবন-থিতানো চেঁচানি। সুধীর তবু আস্তে আস্তে বলেছে, 'কানা-গলি মাধুরী— পথ নেই।'

মনে মনে বলেছে, হিসেব-নিকেশ সে আজই চুকিয়ে ফেলবে। দম-আটকানো মাধুরীর কিছু যেন বুঝেছে এতদিনে — তবু কিছু যেন বাকি থেকে গেছে। সবটা বিশ্রী লাগে তার। নিরবলম্ব — নিরুপায়।

হিসেব চুকে গেল।

কানা-গলি — পথ নেই।

নাই থাক। একটা স্বস্তি বোধ করে সুধীর অসহ্য একটা চাপা গুমোটের মধ্যে। নাই থাক পথ।

'স্কুল গার্ল বাবু — খাপসুরুৎ।— আইয়ে —'

বঁড়শীর মতো চোখ করে একটি কচুয়ান আস্তে আস্তে ফিটন নিয়ে চলে গেল সুধীরের সামনে দিয়ে।

এসপ্লানেডের হাওয়ায় অর্কেস্টা — সহস্রের কোলাহল। সেখানে কোথায় কোন মাধুরীর ফোঁপানি মিলিয়ে যায়, তলিয়ে যায় আস্তে আস্তে।

মাধুরী বলেছিল, 'দূরের মানুষ আপনি — দূরেই থাকুন। বেশ ছিলাম আমি বরং ভাগ্যকে মেনে নিয়ে।'

ভাগ্য।·· কি সে? হঠাৎ বিচলিত মনে হয় নিজেকে সুধীরের।

'হো গিয়া — স্বরাজ হো গিয়া।'— একটা হকার ছুটে গেল সান্ধ্য পত্রিকার বাণ্ডিল নিয়ে।

'কি, অমন প্যাঁচার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' চিফ এডিটার হরিশ দত্ত সামনে এসে দাঁড়ালো।

এই লোকটাকে দেখে হঠাৎ নিজেকে ধাতস্থ মনে হয় সুধীরের। চেম্বারলেনের মতো হাতে ঝোলানো ছাতা, অফিস থেকে বেরিয়ে চলেছে কোনো হোটেল-বারে। একনাগাড়ে তিন-চার ঘণ্টা ধরে সে মদ খাবে, দৈনিকের সম্পাদকদের দু-একটা তাজ্জব খবর দেবে, অথবা রাজনৈতিক শিরোমণিদের জীবনের আস্তাকুঁড় ঘেঁটে হা-হা করে হাসবে আর হাসাবে অথবা দালালী করবে। বেপরোয়া, বেল্লিক। তাকে দেখে স্বস্তি পায় সুধীর। সবটা এতক্ষণে পরিচিত, সহজ লাগে। বললো

'একটা সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছি স্যার। কথাটা কোনো একটা রিপোর্টে ঢুকিয়ে দেবো, কিন্তু রিপোর্টটা যে ঠিক কি নিয়ে হবে — তা এখনও বুঝতে পারছিনে।'

'বটে !' হরিশ দত্ত বললো, 'বড় গোলমেলে লাগছে — তবু বলো শুনি।'

'আমরা কেউ কারুকে ভালোবাসিনে — ভালোবাসতে পারছিও নে।' সুধীর বললো, 'এইটেই আমাদের সত্য। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক রিপোর্টে কথাটা যে কেমন করে ঢোকাই — এখন এমন এক প্রেমের ব্যাপার চলছে !'

'চাকরী যাবে হে সুধীর।' হরিশ দত্ত বললো, 'যাক্, রাখ তোমার প্রেমের কথা এখন। চলো কোথাও গিয়ে ঢুকি। একলা ভালো লাগছে না।'

'আমি যাব ?' সুধীর একটু সসঙ্কোচে বললো, 'কোনো হোটেল-বারে ঢুকলেই তো বন্ধু-বান্ধব জুটে যাবে আপনার অনেক স্যার।'

'এখানে আর স্যার স্যার করো না বাপু।' হরিশ বিরক্ত হয়ে বললো, 'চলো — ভালো ছেলের মতো কোনো হোটেলে গিয়ে ঢুকি। তেষ্টায় আমার হাই উঠছে।'

সুধীর এগোলো হরিশ দত্তের সঙ্গে সঙ্গে।

যেতে যেতে হরিশ দত্ত বললো, 'আমরা কেউ কারুকে ভালোবাসিনে বলছো, — ভালোবাসতে পারছিনে — ও সব বাজে কথা। বরং বলো — ভালোবাসতে জানিনে। যারা জানে — চলো তাদের দেখবে।'

'অর্থাৎ আপনার ওই হোটেল-বারে ?' সুধীর বললে।

'হ্যাঁ হে — সেই স্বর্গে। যেখানে সমাজের দেবতাদের দর্শন মেলে। আর কি ভালোবাসা ! নিজের স্ত্রীর চেয়ে অন্য কোনো একটা স্ত্রীলোকের জন্য তারা সর্বস্বান্ত হয়। একটা স্ত্রীলোকের চেয়ে তারা একটা ঘোড়াকে বেশি ভালোবাসে। আবার ঘোড়া এবং স্ত্রীলোকের উপর ক্ষেপে গিয়ে তারা মাঝে মাঝে রাজনীতিকে ভালোবাসে। আর সে ভালোবাসা কী গভীর ! রাষ্ট্র, দেশ, নীতি, নিষ্ঠা — সব একাকার হয়ে যায় হে সুধীর। অবাক হই — ভালো লাগে, তাই যেচে ওদের কারো না কারো উপকার করতে ছুটে যাই।'

'ঠিক।' সুধীর বলে উঠলো।

হরিশ দত্ত বললো, 'নিশ্চয়ই ঠিক। তোমার এই ঝুটা রিপোর্টের চিন্তা মন থেকে ঝেঁটিয়ে বার কর।— মনে মনে ভেবেছ — মনে মনেই ছিঁড়ে ফেল।'

'ফেললুম স্যার।' সুধীর একটু হেসে শাণিত গলায় বললো, 'সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট হচ্ছিল প্রায়।'

একটি বড় হোটেলে ঢুকলো ওরা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কানে এসে লাগে নরম অর্কেস্ট্রার শব্দ ঠাণ্ডা জলের ঝাপটার মতো। ব্যালকনিতে ঠাণ্ডা নরম আলো। সুধীর যাচ্ছিল একটা কোণের দিকে। হরিশ দত্ত তাকে টেনে বসালো একটা বড় টেবিলে — মাঝখানে। বললো, 'কোণ নিয়ে আমি বসতে পারিনে। ঘুষকির মতো লাগে।'

হরিশ দত্তের ছড়িয়ে বসার অভ্যাস। হোটেল-বারে গেলে সে বসবে বড় টেবিল একটি জুড়ে — সকলের মাঝখানে। একে একে এসে জুটে যায় তার বন্ধু-বান্ধব — দৈনিকের সম্পাদক, বন্ধু সাহিত্যিক, নাট্যকার। তবে তারা বড় হোটেলে বড় একটা আসে না। এখানে দেখা মেলে হরিশ দত্তের রেসকোর্স-ফেরতা বড়লোক বন্ধুদের — খবরের কাগজের মালিক অথবা তার পার্টনারদের। একজায়গায় আবার ভালো লাগে না দত্তের, ঘুরে বেড়াবে সে হোটেলে-বারে বন্ধুদের খোঁজে — গিলে যাবে পেগের পর পেগ। তারই মধ্যে চলে তার রাজনীতির ক্ষেত্রে কূটনৈতিক আদান প্রদান — সংবাদ-সরবরাহ আর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ।

ব্যালকনিতে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে অন্ধকার গড়ের মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়া। একটি মেয়ের রেশমী শাড়ীর আঁচলটা উড়ছে সেই হাওয়ায়, কাঁপছে তার বব্-করা সুন্দর সোনালী চুল। দূর থেকে ভয়ানক নরম লাগে গোলগাল মেয়েটিকে — যেন ছুঁয়ে অনুভব করা যায়। সুধীরের চোখ বারে বারে গিয়ে পড়ছে সেইদিকে।

হরিশ দত্ত চোখের খোঁচা মেরে বললো, 'দেখছ ?'

হরিশ দত্তের কথায় ঢাকাঢাকি থাকে না — হঠাৎ সে বেল্লিকের মতোই বলে বসে কথাটা। অন্যের সংকোচের পরোয়া করে না। কিন্তু সুধীর সংকোচ বোধ করে । বললো, 'দেখছি স্যার।'

'প্রেম প্রেম করছিলে — প্রেম শিখতে হবে ওঁর কাছে গিয়ে। তবে তোমার ইহজন্ম কেটে যাবে। প্রথম স্বামী উনি ত্যাগ করলেন ক্লীব বলে। দ্বিতীয় স্বামী বেছে বেছে হয়রান হয়ে দিশাহারা হয়ে গেলেন শেষপর্যন্ত। — মেজাজ ঠিক রাখলো শুধু এক ঘোড়া। বোম্বের এক রেসের ঘোড়াওয়ালা। ওঁর সামনে যে ভদ্রলোকটি বসে আছেন।'

··· মাধুরী বলেছিল, 'আপনি দূরের মানুষ।' হঠাৎ মনে পড়ে যায় কথাটা।

সুধীর বলে উঠলো, 'কলকাতার বাইরে যেতে চাই স্যার — বদলি করবেন এখান থেকে কোথাও ?'

হরিশ দত্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ সুধীরের দিকে। তারপর বললো, 'প্রেমে পড়েছ — না ?'

'ঠিক উল্টো। ওটা হলো না স্যার — আগেই সেই কথা বলছিলাম।'

'তবে যেতে চাও কেন ? কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা গরম হয়ে উঠবে হে — ক্ষমতা হস্তান্তরের গুরুতর বিষয় কিছুটা এখানে ঘটতে পারে। তাছাড়া কংগ্রেস অধিবেশন। ··· একজন ভালো লোকের থাকা দরকার এখানে।'

সুধীর আর কোন কথা বলে না।

হরিশ দত্ত নিঃশব্দে পানীয়ের গেলাস মুখে তুললো।

চারিদিকটা সুশৃঙ্খল। টিপ্‌টাপ্‌। শব্দহীন। নরম। নরম অর্কেস্ট্রা ছড়িয়ে পড়ছে তার মাঝখানে। আশপাশের চেয়ারে বিদেশীদের ভীড়। ভারতীয় — বাঙালী আছে অল্প বিস্তর — ছড়িয়ে বসে আছে এখানে

ওখানে। নরম আলোর মাঝখানে মরে মরে যাচ্ছে আশপাশের টেবিলের মৃদু কণ্ঠ — চাপা ঠাণ্ডা কথা।

হরিশ দত্তের টেবিলে একটি একটি করে তার বন্ধুবান্ধব বাড়ছে। চেয়ার ক'টি ভরে এলো প্রায়। হঠাৎ হরিশ দত্ত কলরব করে উঠলো একজনকে দেখে:

'এই যে — বিপ্লবী মালিক! অভিনন্দন, ব্রাদার!'

একটি দৈনিকের মালিক নরেশ সরকার। হরিশ দত্তের অভ্যর্থনায় জবাবে হাসলো কি দাঁত দেখালো — বোঝা গেল না।

হরিশ দত্ত আবার বললো, 'অভিনন্দন! যখন ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র ভেড়ার পালের মতো ছুটেছে ক্যাবিনেট মিশনের পেছনে — হাতে ভিক্ষার ঝুলি, তখন তুমিই একমাত্র প্রতিবাদের — বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছ ভাই। অভিনন্দন!'

পাশ থেকে আর একটি খবরের কাগজের মালিক বলে উঠলো, 'নরেশ সরকার আমাদের মুখ রক্ষা করছে — গোলামদের মুখ।'

সরকার হাসতে হাসতে বললো, 'অত্যন্ত দুঃখিত। কাল থেকে আমার পলিসী বদলে যাচ্ছে। মিশন জিন্দাবাদ।'

'এত তাড়াতাড়ি?' হরিশও অবাক হয়।

সরকার হাসতে লাগলো। বললো, 'কমিউনিস্টরাও নেহরুকে সমর্থন করবে। কি পাবে জানিনে।'

বাধা দিয়ে হরিশ দত্ত বলে উঠলো, 'মরুক গে তারা। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ নিশ্চয়ই? কেন্দ্রীয় কিছু একটা বাগিয়ে নিয়েছ বোধ হয়?'

সরকার হাসতে লাগলো।

'থ্রি চিয়ার্স!'

টেবিলে নতুন করে মদের অর্ডার পড়লো।

কোণার ঘোড়াখোর নরম মেয়েটি লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে এই টেবিলের দিকে।

সুধীর হরিশ দত্তের দিকে চেয়ে বললো, 'আমি যাই।'

'এসো।'

হরিশ দত্ত মেতে উঠেছে বন্ধুদের সঙ্গে : রাষ্ট্রনীতি — দর-কষাকষি আর আত্মসমর্পণ। চাপা গলায় চলেছে সোৎসাহে তারই আলোচনা।

সুধীর টেবিল ছেড়ে এগোলো। সিঁড়ি। রাস্তা। অর্কেস্ট্রার মোলায়েম শব্দ হারিয়ে গেল পেছনে।

'টেলিগ্রাম।'

'স্বরাজ হো গিয়া — হো গিয়া।' তখনও একটা হকার হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

'প্যারিস পিকচার সাব।' পেছনে সেই চাপা-গলার বেসাতি।

সুধীর এগোলো। বাস-স্টপেজে এসে শুধালো সে মনে মনে আবার : মানুষ কাঁদে কেন? কেন কাঁদে মাধুরী? কি বলবে সে আজ মাধুরীকে গিয়ে? বলবে, ঘাটতি হিসেব শেষপর্যন্ত মিললো না আর তার।

হিসেব-নিকেশ মিটে গেল বটে — কিন্তু জের রয়ে গেল একটা। তা হলো মাধুরীর কাছে সবটা জানানো। এবং সেইটেই সবচেয়ে শক্ত মনে হয় সুধীরের। কি জানি, হয়তো ফের কেঁদে বসবে মাধুরী আর বলবে — আমার দম আটকে আসছে। ঘরে ফেরার সারা পথটা মনে মনে একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করে সে আর প্রাণভরে ধন্যবাদ জানায় বারে দেখে-আসা সেই ঘোড়াখোর মেয়েটির উদ্দেশে : আহা, জীবন তার কাছে কত সহজ! তার যৌনজীবনের নির্বাচনরীতি, তার দৃষ্টিভঙ্গী, তার জীবনধারা — সবটাই অবলীলায় কত সহজ! আর জয়ন্তী শিল্পযুগের আবর্তে পড়া একটি মেয়ে, তার সঙ্গেও হিসেব-নিকেশ সহজেই মিটে গেল — দিব্যি মিললো না দুটো গরমিল হিসেব। না মিলুক। প্রথমটায় অবাক হয়েছে, ঘাবড়ে গেছে কিছুটা সুধীর — তার চেনা জানা শোনা বহু

মেয়ের মাঝখানে, তার অনেক বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে জয়ন্তী নতুন যুগের একটি চেনা মেয়ে। তার দায় আছে, দায়িত্ব আছে। একদিন তার স্বপ্নও ছিল। পুরানো কথা মনে পড়ে : যখন জয়ন্তী মাধুরীর কাছে গাল পাড়তো তাকে অবিশ্বাসী বলে। সুধীর বলেছিল — মিথ্যাবাদী। হ্যাঁ — স্বপ্নগুলো তার মিথ্যে, আশাগুলো তার মিথ্যে। জয়ন্তী কি ভাববে সে-কথা এখন? বেশ হয়েছে! মনে মনে বলে সুধীর — আর একটা বাঁকাচোরা আনন্দ তাকে উৎফুল্ল করে তোলে। গোলমাল বাধায় শুধু মাধুরীর কথা। তারপর সবটাকে সে মন থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে ঠিক করে ফেলে — চুলোয় যাক মাধুরী আর জয়ন্তী। কালই সে শৈলেনের মেসে গিয়ে উঠবে। দম-আটকানো বেচারী মাধুরীকে সহজে সে কিছুই বোঝাতে পারবে না। নিজেকে কেমন তার দুর্বল মনে হয় আজ। গোরুর মতো শান্ত গভীর এক-জোড়া বোকা-বোকা চোখের সামনে দাঁড়াতে সাহস হয় না তার।

ভয়ে ভয়ে সুধীর ঘরে ঢুকলো — কি জানি, দুপুরের কান্নাচাপা, বাঁকা বিকৃত মুখটা কি অবস্থায় আছে।

আশ্বস্ত হলো সুধীর। মাধুরী হাসিমুখে বললো, 'ঠিক আজকের দিনটিতেই দেরি করে ফিরলেন সুধীরদা।'

'তা দেরিই করলাম মাধুরী,' সুধীর সহজভাবে বলবার চেষ্টা করলো, 'ভয়ে। তোমার কাছ থেকে যতক্ষণ দূরে থাকা যায়।'

'জানি।' শুধু এইটুকু বলে যেন চাবুক-খাওয়া মুখ একটা ঢাকতে চাইলো মাধুরী মুখ ফিরিয়ে। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বললো, 'জয়ন্তী এসেছিল আজ। অনেকক্ষণ ছিল।'

'জয়ন্তী এসেছিল আজ?' কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই সুধীর যেন আবার জিজ্ঞেস করে। তারপর সবটা এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। জয়ন্তীর কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে এগোতে তার আর সাহস হয় না।

মাধুরী পেছনে পেছনে এলো তার ঘরে। সুধীর আতংকিত।

মাধুরী বললে, 'আপনার কানা-গলির কথা উঠল।'—

'ওটা শুধু আমারই বলো না মাধুরী, শুধু একা আমিই থাকিনে', সুধীর বললো। কথায় তার ধার ফিরে আসে। 'আরও অনেকে থাকে — তবে তারা হয়তো জানে না, খোঁজও নেয় না — গলিটা কানা কোথায়। আমি খোঁজ রাখি।'

'সেই কথা সে আজ স্বীকার করেছে।'

'আহা, দলে আমার লোক বাড়ছে!'

মাধুরী হাসলো, বললো, 'আমিও সেই কথাই বলেছি তাকে — ছোঁয়া লাগছে।'

'কি বললো তারপর সে?' কৌতূহল চাপতে পারলো না সুধীর।

মাধুরী বললো, 'চুপ করে রইলো।'

'কেন — তার সেই সমস্ত মিথ্যাকথা গুলো?' সুধীর খোঁচা মেরে বললো, 'আমি তো অবিশ্বাসী মানুষ। কিন্তু তার সেই মিছেকথার তুবড়ি — সে কি শেষ হয়ে গেল?'

'শেষ হয়েছে কি? কি জানি!' মাধুরী বললো। 'আমি ভালো বুঝিনে সুধীরদা — সে হলে হয়তো জবাব দিত। এইটুকু শুধু বুঝি — সাধ-আহ্লাদ, জীবনটাই বা কেমন হবে — এ যদি কেউ মনে মনে একরকম করে ভেবে থাকে, একটু সুখ একটু শান্তির কথা — সে কি অন্যায়? আশাগুলো না হয় মিথ্যেই হয়ে গেল — তা বলে কথাগুলো কি মিথ্যে? কি জানি!'

কথায় ব্যক্তিগত টান মাধুরীর। দুপুরের সেই বেদনাবিকৃত মুখটা সুধীরের মনে পড়ে যায় আবার — সে আর কোনো কথা বলে না। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। জেগেই থাকে।

জেগে জেগে শোনে এ-বাড়ীটায় ঘুমিয়ে যাওয়া— মরে যাওয়ার শব্দ

ক্লান্ত। কানা-গলির ঠাণ্ডা রাত্রি। ঠাণ্ডা অন্ধকার। সারা গলিটার অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যেন তার মধ্যে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। স্টিমারের দু-পাশে ঝাঁপিয়ে-পড়া জোলো ঝাপটার মতো। হয়তো বৃষ্টি নামবে।

বৃষ্টি নামলো। মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ায় ছিটিয়ে আসছে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। গলিতে জলের নরম শব্দ। ভালো লাগছে। সুধীর চুপ করে পড়ে রইলো। নিঃশব্দ সারা গলিটার মতো। টান-টান। অন্ধ। এ-গলিটায়, এ-বাড়ীটায় জেগে থাকার এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। ঠাণ্ডা জলে ভেজা অন্ধকারে যেন ঘনঘোর মৃত্যু। ভালো লাগছে সুধীরের। এই কানা-গলিটার আরও কোনো একটা পুরাতন জীর্ণ বাড়ী — সেখানেও কোনো একটি মেয়ের আশা, স্বপ্ন, জীবনের ছেলেমানুষী খেয়ালগুলোও মরে গেছে আজ। ভালো লাগছে সুধীরের।

অন্ধকার ঘরে নরম পায়ের চাপা শব্দ হলো। কে দাঁড়িয়েছে এসে। মাধুরী।

মাধুরী দাঁড়ালো চুপ করে কিছুক্ষণ। সুধীরের মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল সন্তর্পণে। তারপর বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। অস্পষ্ট ছায়া মিশিয়ে গেল অন্ধকারে। আশ্চর্য! কান্নাবিকৃত মুখটা তবু এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সুধীরের চোখের সামনে!— দম-আটকানো।

তন্দ্রা আসছে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল এ-বাড়ীর — এ-গলির। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে তখনও। কোথা থেকে ভেসে আসছে হৈ-হল্লা, চেঁচামেচি — কান্না। ছেলে-মেয়ে-বুড়োর গলাফাটানো চিৎকার। তার মাঝখানে খোলা আর টিনের চালা টেনে ফেলার শব্দ — সবটা কে কোথায় যেন ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কানা-গলিটা ভরে যায় বস্তির মানুষে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছেই। গলির গ্যাসের বাতিটা নিভে গেছে কখন। কানা-গলির সেই বদ্ধ গুমোটের অন্ধকারে ছেলেমেয়ে বুড়ো-জোয়ান-মরদ গিজগিজ করছে। আর্তনাদ অভিসম্পাত আর কচি ছেলেমেয়ের ফোঁপানি ছাপিয়ে সমানে চলছে চালার টিন টেনে ফেলার হুড়মুড় ঝনঝন্ আর খোলা ভাঙার শব্দ। একপাল বুনো হাতী যেন ঢুকে পড়েছে কেমন করে কানা-গলির শেষপ্রান্তে বস্তিটার ভেতরে।

ভাড়া-করা পঞ্চাশটা লোক অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বস্তির চালার উপরে। বস্তির মানুষ অধিকাংশই ঘুম-চোখে ভয় পেয়ে গেছে — পালিয়ে এসেছে ঘর ছেড়ে। যে-কজন বাধা দিতে গেছে — তারা ডাণ্ডা খেয়ে ফিরে এসেছে। কোঁকাচ্ছে আর খিস্তি-খেউড় করছে বস্তির মালিকের উদ্দেশে।

কান্না, খিস্তি আর অভিসম্পাতের কলরবে মিশেছে বাঙালী, বিহারী আর ওড়িয়ার পাঁচমেশালি গলা।

বস্তির চালা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ভাড়া-করা লোকগুলো। কলরব থিতিয়ে এলো। বাকী রইলো শুধু ফুলে ফুলে ওঠা কচি ছেলেমেয়েগুলোর ভয়-পাওয়া ফোঁপানী আর একটানা গাল-পেড়ে-যাওয়া একটি কর্কশ গলা। সে তারামনি। সে আর থামে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকারে অদৃশ্য শত্রুর চোদ্দ পুরুষ, তাদের আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সব নিপাত করছে তারামনি।

লোহার কারখানায় কাজ করে তার ছেলে — থামাতে গিয়েছিল মাকে। তারামনি তেড়ে গেছে তাকেই :

'ভেড়ুয়া — দালাল।'

একটা বদ্ধ অন্ধকারের গারদে তারামনি যেন ছটফট করছে জ্বালায়। — ভীড়। বদ্ধ অন্ধকারের গারদে ঠাসা। মেয়েরা ছেলেদের মুখে স্তন গুঁজে

দিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো পুরুষদের দিকে। পুরুষরা চেয়ে আছে অন্ধকারে — চালা-ওড়া বস্তিটার দিকে। তাদের উৎখাত করে দিল মালিক।

সুধীর ঘুম ভেঙে উঠেছে। তাকে দেখে মাধুরী ছুটে এলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কি হল সুধীর দা?'

সুধীর হেসে বললো, 'কানা-গলির কানা দিকটার একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে মাধুরী। বস্তির মালিক গুণ্ডা দিয়ে চালাগুলো উড়িয়ে দিয়ে গেল।'

'হায় হায়! অতগুলো লোক' —

সুধীর হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'অনেকগুলো লোক — না?' বলে সে মাধুরীর কাতর মুখটার দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর বললো, 'ভালোই তো হলো। নতুন কোঠা হবে এবার। বস্তির মালিক বহু-দিন ধরে চেষ্টা করছিল। যাক্ — চুকেবুকে গেল। ঘুমোতে যাও এবার।'

মাধুরী কি যেন কান পেতে শুনছে জানালার ধারে সরে গিয়ে — দেখবার চেষ্টা করছে নিচের দিকে চেয়ে। আস্তে আস্তে বললো, 'এখানে কে যেন কোঁকাচ্ছে সুধীরদা — চোরা-গলির ভেতরে।'

দুটো বাড়ীর মাঝখানে হাত-দেড়েক জায়গা — খোলা নর্দমা। দু-বাড়ীর মাঝখানে খোলা নর্দমার চোরা-গলি একটা। কে যেন দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড যন্ত্রণা একটাকে চাপবার চেষ্টা করছে ওর ভেতর ঢুকে। সামনের গলিতে থিতিয়ে-আসা চাপা কলরব আর অভিসম্পাত। তার মাঝখানে চোরা-গলির চাপা গোঙানীটা ফুলে ফুলে উঠছে থেকে থেকে।

হঠাৎ গোঙানীটা ফেটে পড়লো একবার তীব্র চিৎকারে।

সামনের গলিতে চাঞ্চল্য। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পুরুষরা এগোলো।

রাজমিস্ত্রী বৈজনাথের পুত্রবধূ, রাজুর বহু পারবতিয়া সন্তানের জন্ম দিচ্ছে চোরা-গলির ভেতর ঢুকে। সামনের গলিতে বস্তির ভীড়। আর ব্যথাটা তার তোলপাড় করে উঠেছে হঠাৎ এই সময়েই — ভয়ে।

'সরে যাও — পুরুষরা সরে যাও এখেন থেকে।' বস্তির পরিচিত ঝগড়াটে গলাটা যেন হুকুম দিল চোরা-গলির ভেতর থেকে। সে তারামনি। এগিয়ে গেছে কখন। খেঁকরে উঠলো আবার তার কর্কশ পুরুষালি গলায়, 'বলি সরবে, না বাপ-চোদ্দপুরুষের নামগান একবার করতে হবে? কেমন বেহায়া লোক গো সব!' তারপর গলে গলে পড়ে তারামনির গলা, 'আর জায়গা পেলিনি হতভাগী — এখেনে এসে সেঁধিয়েছিস! চল্। ধর্ — মোর গলাটা জড়িয়ে ধর।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বিকারের স্বগতোক্তির মতো গলিটার থিতিয়ে থিতিয়ে মরা হা-হুতাশ থেমে গেছে একেবারে — অন্ধকারের মতোই নিস্তব্ধ। ঝরে ঝরে পড়ছে শুধু অশ্রান্ত একটা কাৎরানি। আর সমস্তটা গভীর অন্ধকারে যেন দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। বৈজনাথের মতো, রাজুর মতো, পারবতিয়ার মতো।

আর একটা শেষ যন্ত্রণার চিৎকার।

রাজুর ছেলে হলো।

··· ওঁয়া ··· ওঁয়া ··· ওঁয়া ·

মাধুরী চমকে ওঠে এতক্ষণে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে সে। এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল দম বন্ধ করে। বলে উঠলো, 'সুধীরদা!'

সুধীর নীরবে তাকালো তার দিকে।

'সিঁড়ির তলায় এককোণে জায়গা হবে একটু,' মাধুরী সাগ্রহে বললো। 'ওদের আসতে বলি।'

সেই দুপুরের কান্নাবিকৃত মুখটা উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে উঠেছে এখন। সে-মুখের দিকে তাকিয়ে সুধীর অন্যমনে শুধু বললো, 'বলো আসতে।'

মাধুরী দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ির তলার হাত চারেক জায়গার মধ্যে নর্দমার কাদা আর দুর্গন্ধে

ভরা দেহ একটাকে কোনোরকমে সাফসুফ করে টেনে আনা হল। কোমর বেঁধে লেগেছে তারামনি। বাচ্চাটা বৃষ্টিভেজা কাপড়ের তলায় চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। আলো নেই। সিঁড়ির আলোর তেরছা রশ্মি একটা এসে পড়েছে কিছু দূরে। তারই মিনমিনে আভা একটু শুধু এসে পড়েছে পারবতিয়া আর তার ছেলের ওপরে। গলির সামনে বস্তির ভীড় — নোংরা, জলে ভেজা। বৈজনাথ ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালো।

তারামনি তেড়ে গেল সেইদিকে, 'দাঁত কেলিয়ে দেখছ কি এখেনে! লজ্জা-সরম নেই নাকি! সরে যাও না এখন এখেন থেকে। মোর এখন ঢের কাজ — সাফসুফ করতে হবে। —'

'মেরে লাল,' — বৈজনাথ হাঁ করে চেয়ে আছে অন্ধকারে — যেখানে কচি তাজা গলা একটা চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে — দমকে দমকে। অস্ফুট কণ্ঠে বিড বিড করে বুড়ো, 'আহ্ হা — মেরে লাল !—'

তারামনি থমকে যায় মুহূর্তের জন্যে। ফেটে পড়ে তারপর, 'হায় রে — মেরে লাল! নদ্দমার কপাল নিয়ে জন্মেছে তোর লাল — তোর নাতি। সরে যা বুড়ো এখন এখেন থেকে — ঢের কাজ পড়ে আছে মোর।'

'কাম করো ভাই — কাম করো তোম।' — বলে সরে যায় বুড়ো — জিভে চুকচুক শব্দ করে। ক্লান্ত বুড়ো গলা আফশোসে খসে খসে পড়ে ভীড়ের মাঝখানে, 'নসিব।'···

'হামারা উমর হুয়া তিনকুড়ি পাঁচ।' — বৈজনাথের গলা শোনা যায় অন্ধকারে — তার পঁয়ষট্টি বছরের অখ্যাত ইতিহাস — টুকরো টুকরো কথা। এই কানা-গলির মহাল্লাটাকে গড়ে উঠতে দেখেছে সে — প্রতিটি গাঁথা ইটের সঙ্গে আছে তার হাতের ছোঁয়া — তার কাম, হিম্মৎ। নসিব রাজমিস্ত্রী বৈজনাথের — তার নাতি ভূমিষ্ঠ হলো চোরা-গলির নর্দমার ভেতরে! মালিক বস্তির চালা উখড়ে দিল — বিলকুল। কিন্তু সেই মালিকের বাড়ীর পর বাড়ী এই মহল্লায় গাঁথনি করলো কে? —

'হাম। হাম — বৈজনাথ।' তারপর বুড়ো চাপা ক্রোধে অভিসম্পাত দেয়, 'বেইমান!'—

তারামনি নতুন প্রসূতি আর বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত। এরই ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে হঠাৎ অকারণেই যেন গাল পেড়ে আসছে পুরুষদের: 'ভেড়ুয়া নিলাজ!' তার কাণ্ডকারখানা দেখে মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে জবুথবু হয়ে এক জায়গায় — যেন আর এক পা এগোলেই তেড়ে আসবে তারামনি। বস্তির অন্যান্য মেয়েরা এসেছিল ভিড় করে — এই হাত চারেক জায়গার মধ্যে ঘিরে বসেছিল কিছুক্ষণের জন্যে পারবতিয়াকে। তারামনি ভাগিয়েছে তাদের সবাইকে।

এক সময়ে ঘুরে দাঁড়ালো তারামনি মাধুরীর দিকে। বললো, 'কি গো ভালো মানুষের মেয়ে — বলি ছেঁড়া কাপড়চোপড় আছে — দিতে পার, না, এই কোণে একটু জায়গা দিয়েই কেতাথ করলে? শুকনো কাপড় চাই — বাচ্চাটা কাঁপছে শীতে — দেখতে পাচ্ছ?'

'দিচ্ছি। এখুনি এনে দিচ্ছি।'— মাধুরী ছুটে গেল ওপরে।

'ভদ্দরলোকের মুখে আগুন।' গরগর করে বললো তারামনি মাধুরীর পেছনে। তারপর তুলে নিল ভিজে কাপড়ে জড়ানো বাচ্চাটাকে নিজের বুকের গরমে: 'আহা লাল রে — বেজোনাথের নন্দমার লাল: বাছা ঠকঠক করে শীতে কাঁপছে কেমন দ্যাখো।' গলে গলে পড়ে তারামনির গলা — দরদে, মমতায়। পরক্ষণেই দাঁতে দাঁত চেপে কাকে যেন গাল পাড়লো: 'হারামজাদা — শয়তান।'

নিস্তব্ধ অন্ধকারে সবটা আবার থিতিয়ে মরে যায়। কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুক ভরে কোথায়। বৃষ্টির বিষণ্ণ শব্দ। নিরবচ্ছিন্ন।

সবাই অপেক্ষা করে আছে ভোরের জন্যে। পারবতিয়া কুঁকড়ে শুয়ে আছে এক কোণে — অন্ধকারে চেয়ে আছে বোবা জন্তুর মতো। বাচ্চাটা চুপ করে গেছে শুকনো কাপড়ের গরমে — তারামনির উষ্ণ বাহু আর কোলের

আড়ালে। কানা-গলির গভীর রাত স্তব্ধ অন্ধকারে যেন জমাট বেঁধে গেছে বাইরে। সবটাকে চমকে দিয়ে, ভেঙে দিয়ে মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে উঠছে শুধু তারামনি। গাল পাড়ে ভাগ্যকে — বাইরের ঘন জমাট পরিব্যাপ্ত অন্ধকারকে যেন : 'পোড়া কপাল! দুখের রাত আর পোয়াতে চায় না।'—

বাইরে কার দীর্ঘশ্বাস আবার কেঁপে কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ — ভোরের অপেক্ষা করছে সবাই।

ভোরের আগে পুলিস এলো — ঘিরে বসলো ভাঙা বস্তি। ভাণ্ডা-খাওয়া জখমী লোকগুলো এগিয়ে গিয়েছিল পুলিসের সঙ্গে সওয়াল করতে — তাদের ধরে নিয়ে গেল থানায়। তাদের মধ্যে আছে তারামনির ছেলে মান্‌কে। হটে এলো আর সবাই — ভয়-পাওয়া, সন্ত্রস্ত।

তারামনি যখন খবর পেল ধরপাকড়ের তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। গলির মুখ বড় রাস্তার কাছে ফাঁকা। তবু ছুটলো তারামনি বাঘিনীর মতো পারবতিয়ার কোলে বাচ্চাটাকে গছিয়ে দিয়ে। কিন্তু কেউ নেই গলির মুখে। হটে গেছে সবাই। ভয়ে হটে গেছে কে কোন দিকে। গাল পাড়তে থাকে তারামনি : 'ভেড়ুয়া — সব, সব শালা সেঁধিয়েছে বৌয়ের কাপড়ের তলায়।— কেউ বললোনি একবার মোকে!'

শুধু একটা কর্কশ গলার ভুতুড়ে চেঁচামেচিই স্তব্ধ গলির মুখে। আর কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। একা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তারপর যেন ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলো তারামনি। এসে গুম হয়ে বসল পারবতিয়ার বাচ্চাকে কোলে করে। একবার শুধু বললো, 'মোর মান্‌কেকে ধরে নিয়ে গেল বৌ!'—

ভোরবেলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো মাধুরী — কানা-গলির শেষ-প্রান্তে চালাভাঙা বস্তি। ছিটেবেড়া ভেঙে ঝুলে পড়েছে কোথাও। বৃষ্টির জলে আর ক্ষ্যাপা জান্তব হাতে খসে খসে পড়েছে লেপা-মোছা চিকন মাটি। মাথা-উঁচু চালাগুলো নেই। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। পোড়া ঘরের মতো —

কালিঝুল হাঁ করে আছে। ভিজেছে নোংরা ঘরসংসার। আরও নোংরা বীভৎস হয়ে উঠেছে। পুলিস মোতায়েনে মেয়েরা আর মরদরা ভেজা ঘরসংসার, হাঁড়ি-কলসি-প্যাটরা মাথায় করে যে যার জিনিস গুছিয়ে বেরিয়ে আসছে একে একে। বিষণ্ণ বিব্রত মুখ। চলে যাচ্ছে একে একে।

সুধীর দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মাধুরী পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'চলে যাচ্ছে সব।'

'তারামনি কোথায়?' সুধীর জিজ্ঞেস করলো।

'বসে আছে গুম হয়ে পারবতিয়ার কাছে। তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'বৈজনাথ আর রাজু?'

'তারাও বসে আছে দরজার সামনে মুখ শুকনো করে। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছে ওরা — কোথায় যাবে?'

'শক্ত কথা জিজ্ঞেস করলে মাধুরী,' সুধীর বললো, 'মহল্লা গড়নেওয়ালা বৈজনাথকে বরং জিজ্ঞেস করো — এবার মাথা গুঁজবে তারা কোথায়। উমর তার তিনকুড়ি পাঁচ — এতদিন ধরে শহর কলকাতার অনেক মহল্লা বানিয়েছে সে, সে-ই ভালো জানে।'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। বুড়ো শুধু কপাল দেখিয়ে দিলে।'

'আহা, মাথা গুঁজবার বড় ভালো জায়গা মাধুরী,' সুধীর বললো। 'আর তারামনি কি বলে — কোথায় যাবে?'

'ওরে বাবা — ওকে জিজ্ঞেস করবে কে।' মাধুরী বললো, 'ওকে আমার জিজ্ঞেস করতে ভয় করে।'

'আমারও মাধুরী,' সুধীর বললো, 'ও হয়তো এখুনি এসে বলে বসবে — বস্তির চালায় টিন তুলবি চল হারামজাদা ভদ্দরলোক।'

মাধুরী আর কোনো কথা বলে না — নীরবে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। বৈজনাথ ঘুরছে মুখ শুকনো করে — গলির এপাশ ওপাশ। কে

বানিয়েছে এ মহল্লা ? রাত্রির অন্ধকারে শোনা বৈজনাথের গলা মনে পড়ে এখনও মাধুরীর — 'হাম। হাম বৈজনাথ।' জলে ভেজা কাদায় মাখা জিনিসপত্র গোছগাছ করছে রাজু। চলে যাবে।

চলে যাচ্ছে একে একে গলি পার হয়ে বড় রাস্তায়। দাঁড়াচ্ছে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে — তারপর মিশে যাচ্ছে জনারণ্যে। খরবেগ স্রোতে।

শহর বাড়ছে। বস্তি ভেঙে গড়ছে মহল্লা। মহাযুদ্ধের সমৃদ্ধি। বাড়ছে জন-সংখ্যার চাপ। শহর বেড়ে চলেছে গ্রাম-বস্তি গুঁড়িয়ে। তবু, কোথায় যাবে বৈজনাথ ? — মাধুরী জিজ্ঞেস করেছিল। বুড়ো শুধু কপাল দেখিয়ে দিলে।

নিজেদের জিনিসপত্র গলির একপাশে টেনে টেনে এনে জড়ো করছিল সুখনলাল আর জানকী। হঠাৎ ঝগড়া লেগে যায় সেখানে। এক জায়গায় জড়ো করা জিনিসপত্র নির্বিবাদে ভাগ করেছে তারা এতক্ষণ :

'ইয়ে হামারা।'

'উও হামারা।'

কোনো গোলমাল নেই। তারপর সুখনলাল চার বছরের ন্যাংটো ছেলে একটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছে, 'চল্ বেটা।'

যাবে কোথায় ? ছুটে এসে চেপে ধরেছে জানকী বাচ্চাটাকে :

'আরে ছোড় রে ! ছোড় মেরা লেড়কা।'

'আরে ছোড় মাগী। লেড়কা হাম লে জায়গা।'

ধস্তাধস্তি লেগে যায় হঠাৎ। উল্কি-পরা শক্ত হাতে চেপে ধরেছে জানকী : বাচ্চা সে দেবে না।

কয়েকজন ছাড়াতে এলো :

'আরে ছোড় দো — ছোড় দো। এ সুখনলাল — এ জানকী।'

'কাহে ?' রুখে দাঁড়ালো জানকী। কর্মঠ চওড়া দেহটা অনেক বড় দেখায় হঠাৎ। সুখনলালের চেয়েও। সবগুলো মেয়ে-মরদের চেয়ে বড়।

মারমুখো। এক রোখা গলায় বললো একভাবে, 'লেড়কা হাম ছোড়েঙ্গে নেহি।'

দশ বছর ঘর করেছে একসঙ্গে শহর কলকাতায় কাম করতে এসে সুখনলাল আর জানকী। ভিনদেশী। অচেনা। তবু ঘর করেছে, বাচ্চা হয়েছে। দারু পিয়ে বহুৎ মারধর করেছে সুখনলাল। আর জানকীর বাঁ হাতে উল্কিতে নিজের নাম লিখে দিয়েছে — সুখনলাল। চুরি করেছে জানকীর গতরখাটা পয়সা। সে সব বহুৎ পারাবী পুরানী বাৎ। সে-সব হিসাব তো বাদ। বিলকুল বববাদ। দশ বছর পরে আবার চলেছে কে কোথায়। যাক, দুঃখ নাই। তবে লেডকা দেবে না জানকী।

'লেডকা হাম ছোডেঙ্গে নেহি।'

তার ভাবীকাল। তার অন্য কোনো এক জীবন হয়তো। তার স্বপ্ন।

টানা-হেঁচড়া আর ধস্তাধস্তি চলতে থাকে সমানে। কুৎসিত গালা-গালি আর ইতরামি। ওদের জীবনের অতীত দশ বছরের যত ক্লেদ আর যত গ্লানি — অপরিসীম কদর্যতার সমস্ত ইতিবৃত্ত মাড়িয়ে এসে দাঁড়ায় আজ নেড়ামাথা বাচ্চা একটা। কুৎ কুৎ করে চেয়ে আছে সে দুর্বোধ্য দুটো চোখ দিয়ে বাপের দিকে, মায়ের দিকে।'

'চল থানেমে।' –

বকের মতো একটা গলা-উঁচু পুলিস লাঠির গুঁতোয় ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় দু-জনকে গলির বাইরে : 'চল হারামজাদী — শালা, চালান করে দিব।'

জানকী লেগে আছে ছিনে জোঁকের মত — টানাটানি করছে তার লেডকার হাত ধরে। বাচ্চাটা কাঁদছে। এখনও কাঁদছে। দেখা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে কান্নার আওয়াজ। আর শোনা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তবু কাঁদছে।

মাধুরী চেয়ে আছে হাঁ করে। অবাক হয়ে গেছে। গলির কানা দিকটায় ছিল এই জীবন। জানকীর দশ বছরের ঘর সংসার। চালাভাঙা

বস্তিটার মতো সবটা আজ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। বীভৎস। যে যার জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। শূন্য খাঁ খাঁ করছে সবটা। পাশের উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর গা ঘেঁষে নোংরা গাদাগাদি ঘরের সারি। পরিকল্পনা-হীন। অপরিচ্ছন্ন। বেপরোয়া। জান্‌কী আর সুখনলালের চাপাপড়া বদ্ধ জীবনের মতো। সবটা আজ অনাবৃত হয়ে গেছে।

পেচ্ছাবপচা দুর্গন্ধ একটা ঘুলিয়ে উঠছে বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধের সঙ্গে। সংকীর্ণতম মেটে গলির পথে একটা ঠেলাগাড়ীও ঢোকে না। ওরই মধ্যে পাররতিয়া বহু হয়ে এসে ঢুকেছে, ছেলে পেটে ধরেছে। বৈজনাথের বয়স হয়ে গেছে তিনকুড়ি পাঁচ। তারামনি বিধবা হয়েছে। অন্যের রক্ষণাবেক্ষণে যৌবন কাটিয়েছে সে — ছেলে মানুষ করেছে। নিজের অধিকার নিয়ে ঝগড়া করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে। পায়রার খোপের মতো এক-একটি ঘর। এক-একটা পরিবারের জগত। এরই মধ্যে বাপ-মা, বৌ-স্বামী দিন কাটিয়েছে জানোয়ারের মতো, ছেলেমেয়ে হয়েছে। মরেছে। হেসেছে আর কেঁদেছে গলা ফাটিয়ে। এ যেন বুনো কলকাতার জন্মচিহ্ন। পুরুষানুক্রমে পুঞ্জিত হয়েছে এসে দুর্বল ভাঙা সমাজের তলানি সেই অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে — কোম্পানীর আমলে যখন এক-একজন সাহেব ঘুষ আর জোচ্চুরির টাকায় ফেঁদে বসতে শুরু করেছে ব্যক্তিগত শিল্প-কারখানা। জড়ো হয়েছে এসে গ্রাম-ভাঙা উৎখাত মানুষ — মজুর। সস্তা মজুরী আর বিপুল মুনাফায় গড়ে উঠেছে শহর কলকাতা — নতুন মহানগর। সমাজের তলানি শুধু থেকে গেছে তলায় — বস্তির বদ্ধ আস্তাকুড়ে, দুর্গন্ধে নোংরামীতে — সুখনলাল আর জান্‌কী, তারামনির জীবনে।

হটে গেল আজ ওরা। শহর বাড়ছে। সমৃদ্ধি বাড়ছে। বাড়ছে জনসংখ্যার চাপ।

বস্তির ভাঙা চালার ওপর দিয়ে ওপাশের চওড়া পিচমোড়া সড়ক দেখা

যায় একটা। এতদিন দেখা যেত না। সবটা যেন দম আটকে ছিল। এখন ফাঁকা হয়ে গেছে — পথ খুলে গেছে আজ।

মাধুরী সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললো, 'আপনার কানা-গলির পথ তো এবার খুলে গেল সুধীরদা। জয়ন্তী আজ এলে বলবো — দেখাবো।'

সুধীর বললো, 'পথ খুললো বটে কিন্তু সে যে কোন কানা জাহান্নমের দিকে — জানিনে মাধুরী। জিজ্ঞেস করে দেখো — তোমার বন্ধু জয়ন্তী জানে কি-না।' বলে একটু থমকে তাকালো সে মাধুরীর মুখের দিকে। ভাবলো বলবে কি হিসেব চুকানোর কথা? তারপর বলে ফেললো :

'হিসেব আমাদের মেলেনি মাধুরী।'

'মানে!' মাধুরী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো যেন।

'কাল হিসেবনিকেশ করতে গিয়েছিলাম,' সুধীর বললে, 'মিললো না মাধুরী। দেখি, তোমার বন্ধুরই মস্ত এক গরমিলের হিসেব।' সুধীর হালকা হেসে বললো, 'আনন্দ হলো, দেখে যে আমি একা নই। একটা নমস্কার ঠুকে খুশি হয়ে চলে এসেছি।'

মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে দেখায় মাধুরীর। শুধু চেয়ে আছে অন্য এক দিকে মাছের মতো মরা ভাবলেশহীন চোখে। সব কথা যেন সে শুনছেও না। মন পড়ে আছে অন্যখানে। অন্য কিছু ভাবছে সে। বলে উঠলো, 'কি বললো সে?'

'বললো — তার পঙ্গু বাপ, কলেজ-ইস্কুলে পড়া ভাইবোন, আরও সব কি।' সুধীর বললো, 'সে মস্ত এক না মেলা হিসেব। তার গম্ভীর মুখ, তার কথা বলার ভঙ্গী — যেন একটা পুরুষমানুষ কথা কইছে।' বলে সুধীর হো-হো করে হাসলো — খানিকটা জোর করেই। সবটাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য। মাধুরীর নরম নিরীহ বোকা-বোকা শান্ত মুখটার স্তব্ধতা সহ্য করতে পারছে না যেন সে। বললো, 'মনে করো কেমন রসিকতা! আমি গেছি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে! প্রথমটা

তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। ফস্ করে মুখে প্রায় এসে পড়েছিল — বলে ফেলি, ভাখো — আমি নই, মাধুরী — মাধুরীই —'

সুধীর থেমে গেল ঝপ করে। মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকালো তার দিকে : মুখে যেন চাবুক মারার ছাপ। আর একটা কথাও বলতে সাহস হয় না সুধীরের। কে জানে — হয়তো এবার কেঁদে ফেলবে মাধুরী। বলবে কালকের মতো — অন্য অনেক দিনের মতো : দম আটকে আসছে তার। শুধু দম আটকে আসছে। তবু বলে সুধীর জয়ন্তীর কথা। বলে তার দায় আর দায়িত্বের কথা, গোটা দারিদ্র্যটা। বললো, 'এর পরেও তোমাদের সংসারের অচল চাকা ঠেলবে কেমন করে সে মাধুরী? ও হয় না।'

মাধুরী কোনো কথা বলে না। কেবলি তার মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যার কথা — ছাদের মলিন অন্ধকারে জয়ন্তীর আশা-আবেগ-স্ফুরিত কথা-গুলো — তার স্বপ্ন, তার কুমারী-জীবনের কল্পনা। হায়রে! কোথায় সেই গড়ে তোলা দু-জনের একখানা ঘর আর পাহাড়-সমুদ্র অতিক্রান্ত দুর্নিবার জীবন। ছোট ছেলেমেয়েদের ভাঙা খেলাঘরের মতো ধুলোয় জঞ্জালে আজ লুটোপুটি করছে সবটা। কালও সে এসেছিল সন্ধ্যাবেলা। সুধীরের সঙ্গে হিসেবনিকেশ চুকিয়েই সে এসেছিল হয়তো। জোর করে মাধুরীর রান্নাঘরে ঢুকে তার হাতের কাজ কেড়ে কেড়ে করে গেছে নিজে — হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়া। মাধুরী ঠাট্টা করছিল।

জয়ন্তী বলেছিল, 'ভাল লাগছে রে। একদিন একটু করিই না তোর গেরস্থালী। — অমন হিংসে করছিস কেন?'

'হিংসে করবো কেন। — ঘোমটাটা বরং তুলে দিই?'

'দে — কিন্তু দেখিস, কেউ না এসে পড়ে।'

মাধুরী ঘোমটা তুলে দিয়েছিল জয়ন্তীর মাথায়।

'কেমন লাগছে রে?'—

আশ্চর্য। উছলানো হাসিটা কানে এসে লাগে এখনও। আজ সকালের আলো-ঢালা দিনে সবটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। সামনের ভাঙা বস্তিটার মতো অভ্যন্তরের সমস্ত গ্লানি, গলিত ক্লেদ আর ব্যর্থতা নিয়ে সবটা যেন দাঁত বের করে আছে। তার সামনে মাধুরী শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেই পারে। আশা, স্বপ্ন, এ জীবনটা এমনি হবে — এমন কোনো পরিকল্পনা, — সমস্ত কিছু লাগে আজ কঠিন বিদ্রূপের মতো। সাহস হয় না কোনো কথা কইতে — এই সুধীর লোকটার সামনে। সে হয়তো হেসে বলবে :

'বোকা! এই-ই জীবন। আমি জানি।'

না। এ জীবন না। কাল সন্ধ্যায় জয়ন্তীর ঘোমটা-তোলা মুখটার উছলানো হাসি মনে পড়ে আর সবটার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে. এ জীবন না। তবু ফাঁকা চোখে সে চেয়ে রইলো : সামনে কোনো অবলম্বন নেই। কে জানে জয়ন্তী আর আসবে কি-না। সামনের ওই ভাঙা বস্তির ওপরে নতুন মহল্লা হবে, বানাবে অন্য কোনো বৈজনাথ। সমৃদ্ধি বাড়ছেই। আলো। গান। কোলাহল সহস্রের। তবু তার অন্ধ অন্তরাল থেকে যেন কালো মুখ একটা ঘোমটা খুলে তাকিয়ে আছে চোখে চোখে। আজ সে প্রত্যক্ষ করলো। কি সে? দারিদ্র্য? মৃত্যু? ধ্বংস? জীবনের ব্যর্থতা? সে জানে না। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহসও হয় না সুধীরকে।

সমস্ত মন আর বুদ্ধি যেখানে সেই মুহূর্তে দোল খাচ্ছে মাধুরীর, সেইখানে একটা খোঁচা দিয়ে সুধীর হঠাৎ নিষ্ঠুরভাবে বলে উঠলো ভাঙা বস্তিটার দিকে চেয়ে চেয়ে, 'পথে খুলে গেল।' বলে হাসলো। আবার বললো, 'জিজ্ঞেস কোরো জয়ন্তীকে — পথ খুললো তার কোন মিছে কথার কল্পনা-রাজ্যে। রাগ করো না মাধুরী — অনেক সুন্দর সুন্দর মিছে কথা সে তোমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল। মন খারাপ করে দিয়েছিল তোমার।

তাই মনে হতো তোমার — দম বন্ধ হয়ে আসছে। এবার ও সব মিছে কথা ভুলে যাও।'—

যাকে অতো বোঝালো — সে আব বসে থাকতে পারলো না। নীরবে শুধু চলে গেল ঘর ছেড়ে। বুঝলো কি-না কে জানে?

দিনটা ছুটির। অফিস ইস্কুলের তাড়া নেই। ছেলেগুলো হল্লা করছে। ঘরে আছে হরেন — অফিস ছুটির গা-এলানো ভাব। এই ঢিলেঢালা ছুটিব দিনের গোটা আবহাওয়া আজ যেন মাধুবীকে গিলে খেতে আসছে। ঠিক এই মুহূর্তে কোথাও কোনখানে একেবারে চোখ বুজে কাজে ভিড়ে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায় সে। হঠাৎ তার মনে একটা ফাঁক তৈরী হয়ে গেছে — সেটাকে সে ভরে তুলতে চায়। অত্যন্ত অস্বস্তিকব মনে হয়। তার সংসারের খুঁটিনাটি আর রান্নাঘব — এই তার বাস্তব জগৎ। মনে মনে বিচবণের জগতটা ফাঁকা শাদা হয়ে গেছে আজ। তাব সেই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জগতেই প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে।

হরেন হাত ধরলো। বললো, 'আজ তো অফিস-ইস্কুল নেই। অতো তাড়াহুড়ো কিসের?'

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো মাধুবী।

'বসো।' হরেন হাসলো।

একটা মানুষ সামনে দাঁড়িয়েও যেমন করে দূরে ছিটকে যেতে পারে — মনে মনে তেমনি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মাধুবী।

'ব্যাপার কি বলো তো?' হরেন মাধুবীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো কাছে। বললো, 'সককাল বেলাই মুখ অতো ভাব কেন? রাত্তিরে কার ছেলে হলো বলছিলে — ভালো আছে?'

'ভালো আছে।'

'অন্যের ছেলের বেলায় তোমার অতো — কিন্তু নিজে তুমি পছন্দ করো না। তুমি যে কি! জানো, আমি কিন্তু ছেলে চাই — তোমাব ছেলে।'—

হরেন তাকে টেনে নিলে নিজের বুকের কাছে। আবেগে। একটা নির্বোধ মাংসের তাল কচি মেয়েকে নিয়ে যেমন করে আদর করে মানুষ, চুমু খায়, এখানে টেপে, ওখানে খোঁচা মারে, তেমনি করে আদর করে হরেন। আর দম বন্ধ হয়ে আসে মাধুরীর। কোথায় ছেলেগুলো হট্টগোল করছে — কে যেন পিটোচ্ছে কাকে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কে — বেণু যে-ঘরে মরে গেছে সেই ঘরে।

তারপর স্বামীর বাহুবেষ্টন আর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে-পড়া একটা আবেগের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রান্নাঘরের কোণায় এসে যখন সে দাঁড়ালো তখন চোখে তার জল এসে গেছে। হ্যাঁ -দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। চিৎকার ক'রে বলে উঠতে ইচ্ছে করে তার।

রান্নাঘরের কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হয় মাধুরীর : সে অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা। এবং অদূর ভবিষ্যতে কোথাও এতটুকু তার আশ্বাসের, আশা করার নেই এই তার জীবন, ভাগ্য। মৃত্যুও। এত স্পষ্ট করে আর কোনোদিনই মনে হয়নি।

সুধীর বলে মিছে কথা। হ্যাঁ- সেই মিছে কথার একটা নতুন জগতকে জয়ন্তী এনে দিয়েছিল তার কাছে বিরাট খোলা আকাশের স্বর্ণ-স্নানে স্নাত। সেখানে তার আত্মা বাঁচতে চেয়েছিল, জেগে উঠেছিল, ভালোও বেসেছিল। জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গেই বাঁচতে চেয়েছিল সে সেই জগতে, ভালোবাসতে চেয়েছিল সেই জগতের সমস্ত আশা আশ্বাস। তার বাঁচার কামনা ভেঙে পড়ছে আজ সবশুদ্ধ হুড়মুড় করে। সামনে অবিশ্বাসী - নির্বিকার সুধীর, চারপাশে দমবন্ধ একটা জগত, আর হরেন। আর ঠিক সেই সময়েই তার স্বামী হরেন এসে দাঁড়ালো তার আবেগ, তার পৌরুষ, তার অধিকার নিয়ে। মন বিদ্রোহ করে। তবু এই তার জীবন, ভাগ্য। মৃত্যুও। ফোঁপায় মাধুরী। জয়ন্তী হয়তো আর আসবে না এ.

বাড়ীতে। হোক মিথ্যে, — মনভোলানো, তবু তারই মধ্যে মনে মনে বেঁচে থাকার একটা জগতের শেষ হয়ে গেল আজ।

একটা নতুন অজানা মানুষকে যেন খুঁজে বের করবে হরেন। রান্নাঘরে মাধুরীর ফোঁপানী দেখে অবাক হয়ে যায় সে। বললো :

'একি। কাঁদছ কেন তুমি ?'

'কিছু না।'

মাধুরী রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল। হরেন থতোমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু ওইটুকু বাড়ীর মধ্যে কতক্ষণ এড়িয়ে চলবে মাধুরী। একসময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় তাকে হরেনের প্রশ্নের মুখোমুখি। এড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়া কোণঠাসা ভীরু মেয়েলী মন হঠাৎ তার রুখে দাঁড়ায় ঋজু হয়ে। পথ হাতড়ায়। বলে ফেলে

'এখানে আমার আর ভালো লাগছে না।'

'ভালো লাগছে না — না ?' হরেন তার প্রৌঢ় বিচক্ষণ গলায় বললে আস্তে আস্তে।

'ধরো তোমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে যদি কিছুদিন থাকি। ছেলে-পুলেরা কয়েকজন, শ্বশুর-শাশুড়ীও গেলেন সঙ্গে।'

'সবাইকে নিয়ে চলে যাবে ?' কেমন ম্লানমুখে হাসলো হরেন।

'কিন্তু কত খরচ কমে যায় এখানে।'

'খরচ ? যা পাই তাইতো করি। সে আমি ভাবিনে। কিন্তু তোমরা থাকবে না — ছেলেপুলে, তুমি — এই সংসার। এ আমি ভাবতে পারিনে।'

হরেনের প্রৌঢ় বিষণ্ণ কথাগুলো কাকুতিমাখা, মমতায় ভরা, দুর্বল। তার মাঝখানে মাধুরীর চলে যাওয়ার কথা রূঢ় শোনায়।

তবু সে চলে যেতে চায়। হাতড়ে হাতড়ে একটা পথ খুঁজে পেয়ে গেছে সে — অন্ধের মতো সেইটেই খুঁজে খুঁজে চলে। জয়ন্তীর কথা উল্লেখ করে বললো : 'বিয়েটা বোধ করি ভেঙেই গেল !'

'কেন ?'

সুধীরের হিসেবনিকেশের কথা বলে মাধুরী। বললো, 'আমরা ক-জন চলে গেলে এখানকার খরচের বোঝাও তো কমে। আর সুধীরদা হয়তো বিয়েও করতে পারে।'

'তারপর ?— তুমি তো এখানে থাকতে চাও না ?'

আবার সেই একটা কথা এসে পড়ে — যেটা নানাভাবে এড়াতে চায় মাধুরী। চুপ করে রইলো।

হরেন বললো, 'সুধীরকে আমি বুঝতে পারিনে। কি যে তার হিসেব-নিকেশ !— আমি বুঝি, ভাগ্য। যা হওয়ার হবেই।— তুমি এলে, শৈলেন চলে গেল। ফেরাতে গেলাম কতদিন — এলো না। আবার তুমি চলে যাবে বলছো !'

আর কেউ কোনো কথা বলে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হরেন শুধু বললো, 'ভাগ্য !'

কথাটায় দম বন্ধ হয়ে আসে মাধুরীর আবার। চোখে চোখে চায় সে একটা প্রৌঢ় বিষণ্ণ মুখের দিকে, তার দম বন্ধ জগতের একটা কানা কোণ থেকে : সে মুখের বিমর্ষ আবেদন স্ত্রী চায়, ছেলে চায়, সংসার চায়।

সেদিন ছুটির অলস দুপুরটা অত্যন্ত দুঃসহ মনে হয় হরেনের। ক্লান্ত আর বার্ধক্যশ্রান্ত।

সুধীরের ছুটি নেই।

তার অফিস বেরুবার মুখে মাধুরী বললো, 'আমার একটা চিঠি জয়ন্তীকে পৌছে দিতে পারবেন সুধীরদা ?'

'তা পারি, কিন্তু তোমার মতলব কি ?' সুধীর সন্ধানী চোখে তাকালো।

'ভয় নেই। ওতে আছে শুধু আমারই কথা — আপনারও না, তারও না।'

'তা হলে পারি।' বলে হাসলো সুধীর। বললো, 'কিন্তু, তবু কেমন

সন্দেহ হচ্ছে মাধুরী।— তোমার কি এমন কথা আছে জানিনে'— বলে থেমে গেল সুধীর। হঠাৎ মাধুরীর মুখটাকে বেদনা-পাণ্ডুর মনে হয়।

মাধুরী তখন সুধীরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে — বলবে কি তার চলে যাওয়ার ইচ্ছের কথা! শুনে অবিশ্বাসী লোকটা হয়তো এখুনি হেসে উঠবে — বিদ্রূপ করে বসবে। কোনো দিন কারুর কোনো আবেগের যে ধার ধারেনি — উল্টে শুধু ধারালো আঘাতই দিতে জানে — তাকে তার কথা বলে আর লাভ কি?

সুধীর আবার নরম গলায় বললো, 'কি লিখলে?'

'আমি বোধ হয় চলে যাচ্ছি সুধীরদা।' মুখ নিচু করে বললো মাধুরী।

'পালাতে চাও কানা-গলি ছেড়ে? কিন্তু যাবে কোথায়? বাপের বাড়ী?'

'না। আপনাদের গ্রামের বাড়ী।'

'যাক। আশ্বস্ত হওয়া গেল।' সুধীব শাণিত গলায় বললো, 'কাবণ, গ্রামের কোনো বাড়ী আমাদের আছে বলে আমাব জানা নেই। ছিল একসময়ে — এখন অন্যের এখতিয়ারে। তোমাকে তারা সেখানে ঢুকতে দেবে না।'

'কেন?'

'অন্তত ঢোকা সহজ নয়। এবং আমাদের এমন সুন্দর কানা-গলি থেকে পার পাওয়াও সহজ নয়। কই দাও তোমার চিঠি।' বলে নিঃশব্দে হাসতে হাসেতে চিঠি নিয়ে চলে গেল সুধীর।

ঘর থেকে বেরুবার মুখেই বাঁধাছাঁদা হয়ে পড়ে আছে বৈজনাথ আর তারামনির ঘরসংসার। চলে যাওয়ার মতো। চলে যাবেও। কোথাও হয়তো গ্রামে। বৈজনাথ আর তার বেটা মহল্লা বানাবে এখানে। মনে মনে কথা বলে সুধীর। সন্তর্পণে তাকায় তারামনির দিকে। গলির একপাশে তিনখানা ইট পেতে রান্না বসিয়েছে সে। কালো মুখটা জলভরা মেঘের মতো: ছেলে তার এখনও ফেরেনি থানা থেকে।

বাড়ী থেকে অফিস — সারা পথটা সুধীরের চোখে পড়ে : অনেকেই চলে যাচ্ছে যেন কে কোথায়। ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, মাথায় মোট।— শহর ছাড়া ভাব। ছাড়ছে — পালাচ্ছে। মাধুরীও পালাতে চায়। ওই আবার একটা ট্যাক্সি!— আশ্চর্য! এইগুলোই চোখে পড়ে আজ — অথবা চোখ তার অন্য অনেক জিনিসের মাঝখানে এইগুলোকেই খুঁজছে শুধু, মনে করে রাখছে।

অফিসে ঢুকলো। তার টেবিল। চেয়ার। ফাইল।

তাকে দেখে অবনী চাপা গলায় বলে উঠলো, 'জোর খবর আজ সুধীরদা। ফৌজ পুলিশ পর্যন্ত একে একে বিদ্রোহ করছে — এগিয়ে আসছে মজুরদের ধর্মঘটের দিকে। বিহার, দিল্লী, বোম্বে।'

অবনী একটা রিপোর্ট তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'পড়ুন।'—

'বিপ্লব!' বলে না পড়েই রিপোর্টটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে সুধীর বললো, 'আজ একটা মজার জিনিস লক্ষ্য কবলাম আসতে আসতে। এত লোক চলে যাচ্ছে শহব ছেড়ে!'

'কেন?' অবনীর জিজ্ঞাসায় গুরুত্ব।

সেই গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে সুধীর বললে, 'মার খেয়ে!'

'মার খেয়ে? কোথায় কি হলো?'

'কোথায় নয়?' সুধীর বললো, 'আমি দেখছি — শুধু পালাচ্ছে। আমাদের কানা-গলি থেকে, শহরের এখান-ওখান থেকে। বুঝলে অবনী, তোমার বিপ্লবেব কোন নবীন জনতা কোথাকার কোন শহর ক'দিন অধিকার ক'রে রাখলো কে জানে। ও সব ঝুটো রিপোর্ট। আমি দেখছি, শুধু পালাচ্ছে। ওই একটি রিপোর্টই লেখার আছে। পারো তো লেখ।'

অবনী বললে, 'বুঝলাম এবার আপনার কথা। চোখ খুঁজে খুঁজে আপনার শুধু এইগুলোই দেখছে। লিখুন আপনার রিপোর্ট — এ অফিসের আপনি যখন চিফ রিপোর্টার। আমি হলে লিখতাম — আসছে, আসছে।'

'সে লেখা ছাপা হবে না।'

'তাতে আসাটা আটকায় না।'

'কিন্তু যাওয়া? সেটার কি হলো? সেটাই বা আটকাচ্ছে কে অবনী?' সুধীর ঘুরিয়ে বললো।

অবনী রাগ করে আবার বললো, 'আপনার চোখ শুধু ওইগুলোই খোঁজে।'

তা-ই হয় তো। সুধীর খুঁজছে। কানা-গলি, মাধুরী, জয়ন্তী — তাদের পরিবার, বস্তির মারখাওয়া মানুষগুলো — সবাই যেন ভীড় করে আসে তার মনে। ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে — ছুটে পালাতে চাইছে মার খেয়ে। যাবে কোথায়? কোথায় এ সম্রাট রাজধানীর অধিকারের শেষ?

সামনের খোলা জানালা দিয়ে গড়ের মাঠ উঁকি মারছে। কোন্ আদ্যিকালের কলকাতার চিহ্ন একটুকু — তার গাছ, তার মাঠ আর মাটি। দুপুরের রোদে পিঠ দেওয়া। এইরকম কোনো এক বুনো মাঠের দেশে আজ ফিরে যেতে চাইছে মাধুরী — পালাতে চাইছে, বস্তির মারখাওয়া লোকগুলোও। ওইরকম গ্রাম-দেশ থেকে ছুটে এসেছিল একদিন এইখানে: আহা — শহর! ... শহর কলকাতা!

জানালা দিয়ে সারা গড়ের মাঠটা ধূ-ধূ করছে। ওই দিকে চেয়ে চেয়ে মাধুরীর গ্রামে ফেরার কথা মনে করে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। গ্রাম! সে কতদিন হলো, গ্রামের কথা পুরানো হয়ে গেছে। সে কতদিন হলো — গ্রাম সুতানুটি গোবিন্দপুর কোথায় ভেঙে চুরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। চৌরংগী রোডের দিক ঘেঁষে গড়ের মাঠের পুব সীমান্তের এক গাছ তলায় কতকগুলো মুটে রিকসাওয়ালা দেহাতী মানুষ জটলা পাকিয়েছে। ওদের গোল ভিড়ের মাঝখানে কে একজন যেন গলা ছেড়ে গান ধরেছে — টানা গেঁয়ো সুর একটা। বোবা আর্তনাদের মতো — সেটা এসপ্ল্যানেডের যন্ত্র-ঘর্ঘরিত হাওয়ায় মিলিয়ে মরে যাচ্ছে কেঁপে কেঁপে গ্রাম গোবিন্দ

পুরের আত্মার মতো। বুনো কলকাতার হঠাৎ এক টুকরো ছবি ভেসে ওঠে সুধীরের চোখের সামনে। যেন ওই গড়ের মাঠের এক কোণায় — জংগল-গিরি চৌরংগী সাধুর দুর্গম জংগলের এক ধারে একটু ফাঁকা জায়গায় গান ধরেছে কোন ভিখিরী বৈরাগী ফকির :

কি হলো রে জান্।
পলাশী ময়দানে সিরাজ হারাইল পরাণ॥

আপ্তিকেলে আঁকাবাঁকা চিৎপুর রোড ধরে হেঁটে হেঁটে এসে, ওয়াটালু স্ট্রীটের বরাবর কাটা খালের সাঁকো পার হয়ে কালিঘাটগামী ধূলিধূসর তীর্থ-যাত্রীর দল জমে গেছে বৈরাগীর গানের কাছে — শুনছে তন্ময় হয়ে। হঠাৎ এক ভাঙা-গড়ার ভাগ্য বিপযয়ের সামনে সবাই যেন ভুলে গেছে সামনের তীর্থ-পথের কথা। গড়ের মাঠ দুর্ভেদ্য জংগলে ভরা — তার ভেতরে এঁকেবেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে তীর্থমুখী হেঁটো পথ — কয়েক শ' বছর আগের চৌরংগী রোড। তার দু'পাশে, অন্ধকার ঝোপ জংগলের আনাচে কানাচে ঠ্যাঙাড়ে আর লুঠেরা, ওৎ পেতে আছে যাত্রীদের জন্যে। ওদিকটা জনমানব বসতিহীন — শুধু অরণ্যের পুঞ্জিত শ্যামতরংগ। খালের ওপারে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, সেনট্রাল এ্যাভিনিউর দিকে ছাড়া ছাড়া টঙের মতো কুঁড়ে কয়েকটা ছিটানো — লাল দীঘি অঞ্চলের সায়েব সুবোদের কয়েক ঘর চাকর বাকরের বাস। আর কয়েক ঘর জেলে, মাঝি-মাল্লা। ঠ্যাঙাড়ে লুঠেরার ভয়ে তারাও তটস্থ — রাতভিতে চলা ফেরা করে না কেউ। ভীরু শান্ত গ্রামের অবোধ মানুষগুলি। রাতের বেলা ঘরের ঝাঁপবন্ধ ক'রে শোনে সাহেবদের থেকে থেকে ডাকাত তাড়ানো বন্দুকের শব্দ — কখনো চৌরংগী সাধুর থানায় গড়ের মাঠের জংগলে বাঘের গর্জন। আর সারা রাত খালের জলস্রোতে জোয়ার ভাঁটার অশ্রান্ত কলোচ্ছ্বাস। সুদূর মানুষের কলকণ্ঠ শোনা যায় যেন কোন এক আরণ্যক ভোরের আগে :

'হারে ভেগো, মাচকে যাবি কি-না! আতি তো কোয়া কোয়া করিছে। মুই ফুকারছি —তুই ঘুমাইছিস!'

'যা চেঁদে তুই। কাল ঢের আতি থাকতে গেছিনু। যাড় বলে খাবার মাছ পেনু না।'—

'ত্যাবে তো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু। তোর বড় দেকি সুকবাসের শরীল।'—

ছল্ ছল্ করছে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট। কোথায় গেল সেই কুঁড়েগুলো? এ সমস্তটা ব্যাপ্ত ক'রে, স্মৃতি-বিস্মৃতি জুড়ে গেঁয়ো টানা কান্না একটা যেন গুমরে উঠছে।

ঘোড়া শালে ঘোড়া কান্দে হাতী শালে হাতী।

কলিকাতায় বসি কান্দে মোহন লালের বেটি॥...

ঠ্যাঙাড়ে লুঠেরার দল হয়তো সে গান শুনে সেদিন হতচকিত হয়ে গেছে — হাতের মুঠো শিথিল হয়ে খসে পড়েছে পাকা বাঁশের লাঠি।

তাদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল গোবিন্দপুরের বাদা-বন আর জংগল, উৎখাত হয়ে গেল তার প্রজা আর বুনো প্রশান্তি। জন্ম নিলো সাহেব বিবির বেড়াবার পার্ক গড়ের মাঠ। শুধু জংগল-গিরি সাধু চৌরংগীর নামটুকু নিয়ে একপাশে পড়ে রইলো একখানি সড়ক — চৌরংগী রোড। ভরাট হয়ে গেল ওয়াটার্লু স্ট্রীট এলাকার খালের সোঁতা, এক কোণায় শুধু পড়ে রইলো সে ভরাট বুকে ক্রীক রো,— ভাষান্তরিত এই ইংরেজি নামটুকু নিয়ে। কোথায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল গোবিন্দপুর গ্রাম! তার সমাধির ওপরে উদ্ধত প্রাসাদ সৌধের সারি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো নতুন এক রাজধানী —'সাহেব বেনের শহর কলকাতা! তার ডাকহরকরারা ছুটলো গ্রাণ্ডট্রাংক রোড ধরে দিকে দিগন্তরে। লাল কাঁকর-ভাঙা নতুন নতুন সড়ক রক্তাভ জিভটা যেন বাড়িয়ে দিল গ্রাম-গ্রামান্তরের দিকে।

সুধীরের ঠাকুর্দার বাবা বলেছিলেন, যখন নতুন সড়ক একটা চলে গিয়েছিল তাঁর গাঁয়ের পাশ দিয়ে, 'খাল কেটে কুমীর আনা হলো।'

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি — বেদজ্ঞ পুরোহিত। বুঝেছিলেন — গাঁই-গোত্রে বাঁধা অন্ধ গ্রাম তাঁর ছুটবে এবার ওই সড়ক ধরে।

বেশী দিন গেল না — ছুটলো তাঁরই ছেলে, সুধীরের ঠাকুর্দা। ইংরেজ বিদ্যায়তনের বিদ্যাই তাঁকে টান মারলো শহরের দিকে।— সাহেব কোম্পানীর চাকরী।

বেদজ্ঞ পুরোহিত বাপ বেদনাহত হয়ে বলেছিলেন, 'এখানে কি হবে তা হলে? আমি অথর্ব হয়ে গেলাম — দেবতার মন্ত্র ভুলে যাই।'…

ঠাকুর্দা নাকি বলেছিলেন, 'ও এখন ভুলেই যান।'

'গৃহদেবতার পুজো? এতগুলি ঘর … সমৃদ্ধ যজমান! রায়রায়ান গুষ্ঠি, চৌধুরী বাড়ী, দত্ত মজুমদারেরা'—

'তারা আপনার গ্রামে আর আছে কে?'

'বলি ঘরগুলো তো আছে? দেবতা তো আছেন?'

'আছেন ওই নামেই। ধুলো জঞ্জালের গোরস্তান হচ্ছে।'

'কি বললে! কি অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করলে তুমি! তুমি আমার পুত্র?'

'যা সত্যি — তাই বললুম। নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন।'

দেখতে পাচ্ছেন — অথর্ব বেদজ্ঞ পুরোহিত ঘোলাটে চোখ তুলে দেখতে পাচ্ছেন — ক্ষ্যাপা ঝড়ের মুখে বনেদী বংশের মানুষগুলো যেন উড়ে চলে যাচ্ছে কোথায় কোন ম্লেচ্ছ শহরের দিকে। চোদ্দ পুরুষের ভিটেগুলো শুধু জগদ্দলি পাথরের মতো পড়ে আছে গ্রামের মাটিতে। দু-পুরুষের মধ্যেই বড় বড় কোঠাগুলো ভুতুড়ে হয়ে এলো। তবু ছেলের মুখ থেকে তিনি এ সব কথা প্রত্যাশা করেননি যেন। অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। থামিয়েছিল তাঁর সপ্তদশী পুত্রবধূ এসে।

'বাবা!'

'না বৌমা, না!' অথর্ব দেহটা শেষবারের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, 'আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করবো। ও বিধর্মী — ও নাস্তিক, ও কুলাংগার। আমি আর পারছি না। আমার সমস্ত শরীরটা কেমন করছে বৌমা! হা বিধি! হা বিধি!'—

সেই শয্যা গ্রহণই তাঁর শেষ শয্যা।

আর সেই সপ্তদশী ঠাকু'মা তাঁর এক বছরের শিশু পুত্রটিকে ঠাকুর্দার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ — ভালো মন্দ বুঝিনে। কিন্তু এই শিশুকে তুমি ফেলে যাবে ?'

'তবে এখুনি বেবিয়ে এস আমাব সঙ্গে।'

'আর শ্বশুর ঠাকুর ?'

'তবে থাক তুমি।'

'ফেলে যাচ্ছ আমাদের !'—

'যেতে দাও বৌমা — দেবতা আছেন। ও জন্মের মতো চলে যাক। আমি ভাববো — ও মরে গেছে।' পাশের ঘর থেকে শেষ ক্রুদ্ধ চিৎকাব ফেটে পড়েছিল অথর্ব কণ্ঠে।

'এই আমাকে তুমি ফেলে যাচ্ছ ! — এই আমাকে তুমি —'

ঠাকুর্দার মুখে শোনা গল্প। সুধীব দেখেনি সে দুয়োবাণী ঠাকু'মাকে। তবু আন্দাজ কবতে পারে — কি দীপ্ত ভঙ্গীতে সেদিন সেই সপ্তদশী, ভরা যৌবনা সুন্দরী মেয়েটি অশ্রুসিক্ত চোখে হতচকিত হয়ে দাড়িয়েছিল বৃথাই পথ আগলে। হেরে গেল তবু — সুধীর জানে, হেবে গিয়েছিল সেই দুয়োরাণী ঠাকু'মা, হেরে গিয়েছিল ভরা যৌবনবতীব রূপ, হেবে গিয়েছিল ভাঙা পদ্মদীঘি গ্রাম। গ্রামেব সেই রূপবতী মেয়েটি তো জানতো না — আর এক দেশের নগর সীমায় আস্তে আস্তে লাগছে যৌবনেব জোয়ার, তার আকর্ষণ অনেক অনেক বেশী।

এসপ্ল্যানেডের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় সুধীবের — কলকাতাব পুবসীমার লোনাজলার জল বর্ষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বিষাক্ত কাঁকড়া পচা গন্ধ নিয়ে একদিন নগরের প্রাণকেন্দ্রকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে যেত। বর্ষাব শেষে জল একটু সরে গেলে কাঁকড়া আর মাছের পচা গন্ধে ভারি হয়ে উঠতো রাজধানীর হালকা হাওয়া। ধরতো মড়ক, মহামাবী। শুধু ওই

ক'মাসে প্রতিবছর হাজার হাজার সাহেব বিবি গোরস্তানে আশ্রয় নিত। ঘরে ঘরে রোগ। কে কার খবর নেয়!

খবরাখবর নিত প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি — যারা বেঁচে গেছে। সবাই ছুটতো ১৫ই নভেম্বরের মিলন সভায়।

'হ্যাল্লো হ্যারিসন!'

'হ্যাল্লো মিস্ মরিসন!'

'কি হরিব্‌ল দেশ!'

'গেল বছর মরেছিল দু'শো আর এবার ঠিক তার ডবল।'

'এ দেশে আমরা কেউ বাঁচবো না — বুঝলে?'

'তোমাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে এ্যাটকিনসন!'

'বেঁচে গেছি কোনো রকমে এ যাত্রায়।'

'হোমের খবর কি?'

'ভাবছি, পরের জাহাজেই পালাবো।'

কতগুলো বেঁচে যাওয়া বিদেশী লোকের হৈ-হুল্লোড় ··· ঘন ঘন যিশুর নাম ··· ঈশ্বরের অপার করুণার প্রশস্তি আর চাপা ফোঁপানী এখানে ওখানে। এর মধ্যে কে একটা খবর জোর গলায় প্রচার ক'রে দিল যেন:

'এ্যাটকিনসন একটা কবিতা লিখেছে।'

ভীড় কলরব থামিয়ে উৎকর্ণ হলো।

'চুপ্ — শোন।'—

দীর্ঘদিন রোগে ভোগা এ্যাটকিনসনের ক্ষীণ গলা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ভীড়ের মাঝখানে:

... On everyside tall trees shut out the sight;
And like the upas, noisome vapours shed.
Day blazed with heat intense, and masky night
Brought damp excessive, and a feverish bed:
The travellers at eve were in the morning dead.

অরণ্যের অন্ধকার ··· দুর্গন্ধে ভারি পচা হাওয়া ··· ঠ্যাঙাড়ের করুণায় নির্ভর পথিক-জীবন — দুঃসহ দিন আর রাত্রি! কবিতার মর্মান্তিক এই বিষয়বস্তু। কবিতা পড়া শেষ হলে মিলিত ভীড়ের মাঝখানে পড়ে গেল হাততালি আর বাহবা, — বন্ধুরা ঝাঁকানি দেয় এ্যাটকিনসনের হাত ধরে।

'মর্মান্তিক বাস্তব চিত্র। ভেরী গুড।'

'আবার পড় এ্যাটকিনসন।'

সেই মৃত গোবিন্দপুরের কবরের ওপরে আস্তে আস্তে শতাব্দী জুড়ে লেগেছে নগর-যৌবনের জোয়ার। ঝকমকিয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে নতুন নতুন পথঘাট পার্ক — মাথা তুলেছে কোম্পানীর বেনেতি কোঠা, জুড়ি হাঁকিয়ে ছুটে গেছে সাহেব-বিবি — পৎপৎ ক'রে উড়েছে কোম্পানীর নিশান। মায়েরা ছেলে ঘুম পাড়িয়েছে নতুন গান গেয়ে:

দেখো মেরি জান।
কোম্পানী নিশান।
বিবি গিয়া দমদমা
উড়া স্যায় নিশান।
বড় সাহেব ছোটো সাহেব,
বাকা কাপিতান।
দেখো মেরি জান। ···

আর, এই নতুন রাজধানীর নতুন সড়কে একপাল ক্ষুধার্ত শিশু ছুটেছে এক ইংরাজ শিক্ষাব্যবসায়ীর পালকীর পেছনে পেছনে — ধূলিধূসর, ক্ষুধার্ত শুকনো মুখ। ধাওয়া ক'রেছে হেয়ার সাহেবের পাল্কীর পেছনে ভিখিরীর পালের মতো:

'Me poor boy, have pity on me, me take in your school'···

অভিভাবকদের শেখানো বুলি: ইংরেজের পাঠশালায় পাঠ নেওয়ার আকুল আবেদন। তাই আউড়ে ছুটে চলেছে ছেলের পাল গঙ্গার

ধারের কোন গ্রে সাহেবের কুঠি থেকে সারা মধ্য কলকাতা — পাল্কীর পেছনে পেছনে।

সেই রাজধানীই টান মেরেছিল একদিন সুধীরের ঠাকুর্দাকে — তারই শিক্ষার রুচি ও পরিবেশ ম্লান ক'রে দিয়েছিল দুয়োরাণী ঠাকু'মাকে। আবার বিয়ে করেছিলেন ঠাকুর্দা — সুয়োরাণীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তিনি কাজের টানে শহর থেকে শহরে। এরই মধ্যে — জন্মভূমিহীন এক জন্মের ধারায় পরিবর্ধিত হয়েছে সুয়োরাণীর গুষ্ঠি। তাদের ভিটে নেই, ভূমি নেই, গ্রাম নেই, দেশ নেই — আছে শুধু শহরের ভাড়াটে বাড়ী। একটা বাড়ী ছেড়ে আর একটা বাড়ীতে যাওয়ার সময় কান্না নেই, দুঃখ নেই ভিটে ছাড়ার। এই জীবন ছেড়ে মাধুরী পালাতে চায় আজ সেই বহুদিন আগে ফেলে আসা দুয়োরাণীর দেশে — যেখানে এ বংশের একটি অবরুদ্ধ ধারা থেকে গেছে ক'পুরুষ আগে। সেখানে কি মাধুরী গিয়ে পাত্তা পাবে? কে জানে, সেখানে হয়তো আছে সুধীরেরই অনেক ভাই। সেখানে সুধীরই যদি গিয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা কি চিনতে পারবে আজ উৎপাটিত মূল একটি রক্তের আত্মীয় ধারাকে? স্বীকার করবে?

করবে না। সুধীর মনে মনে জানে। তবু, মাধুরী পালাতে চায়। এখানে ক্ষুধার্ত দিন — দুর্মূল্য শহর — আর অন্তর-দ্বন্দ্ব সহস্রধান। কলকাতার সমস্ত বুনো শূন্য স্থান সৌধে আর ঐশ্বর্যে ভরতে ভরতে যতো পূর্ণ হয়ে উঠছে ততো কেঁপে উঠছে মানুষের পায়ের তলের মাটি: ভেঙে পড়বার যেন পূর্ব মুহূর্ত। মানুষ আছে বটে — তবু যেন থাকতে পারছে না। পালাতে চায়। পালাচ্ছে মার খেয়ে। এতদিনে বোধ করি শেষ হয়েছে সেই একদিনের গড়ে ওঠা রাজধানীর শিক্ষা:

··· me poor boy, have pity on me ···

বিকেলের ম্লান ছায়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে গড়ের মাঠে — গোবিন্দপুরের বিস্মৃত জংগলে। সুধীর চেয়ে আছে। চোখে পড়ে একটি একটি করে ছাত্র

আর মজুরের মিছিল জমছে এসে ময়দানে — মনুমেণ্টের তলায়। হয়তো মজুরদের কোনো মিটিং আছে। দূর থেকে ভেসে আসছে তাদের আস্ফালিত গর্জন : বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক :

সুধীর অবনীর দিকে ফিরে তাকালো। অবনী জিজ্ঞাসু চোখে তারই দিকে চেয়ে আছে — মুখে কৌতুকের হাসি।

অবনী বললো, 'দেখছেন ?'

সুধীর বিদ্রূপ করে বললো, 'দেখছি। কিছুক্ষণ পরে ওরা হাল্লা করতে করতে আবার কোন অন্ধকার গর্তে গিয়ে ঢুকবে। বরং তোমাকে একটা জিনিস দেখাই — ওই যে, ময়দানের বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে, একটা লোক মরে পড়ে আছে দেখছো ? দেখছিলুম, অনেকক্ষণ ধরে কাকে ঠোকরাচ্ছে।'

অবনী মিটিংয়ের মিলিত ভীড়ের দিকে আঙুল তুলে বললো, 'এ মরা শহরের লাস সাফ করবে ওরা এসে।'

অবনী এই রকম একটা ফাঁপাই কথা বলবে — এ সুধীর জানে। জানে — সে হয়তো আরো বলবে, ওরা এসে আর একটা নতুন শহর গড়ে তুলবে। সুধীর হাসলো। সে দেখছে সেই কবেকার মৃত গোবিন্দপুরের প্রেতাত্মাকে — পথের পাশে পড়ে থাকা কাকে ঠোকরানো মৃতদেহে — ঐশ্বর্য-মিছিলের পথে, তাদের কানা-গলিতে, মাধুরীর হাঁফ-ধরা জীবনে।

এমনি করে একদিন গ্রাম-জীবনের চরম গ্রাম্যতায় মরে গেছলো গোবিন্দপুর আর গ্রাম পদ্মদীঘি। তারপর তার আর কোনো কথা ছিল না। আজ এ মহানগরেরও সুরু হয়েছে চরম নগরালি — তার চরমতম রূপ। তারপর ? অবনী হয়তো সোৎসাহে বলবে, তারপর বিপ্লব। হাসি পায় সুধীরের। সে বিশ্বাস করে না।

গোবিন্দপুরের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজপথের আনাচে কানাচে। সুধীর যেন তাদের অনুভব করতে পারে।

অফিসের শেষে সুধীর যখন বেরুলো — পেছনে অবনী। পথে সুরু হয়েছে তখন অফিস ফেরতা ঘরমুখো জনস্রোত।

চৌরংগী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবনী বললো, 'সুধীরদা, চলুন গড়ের মাঠে ঘুরে যাই।'

'মানে তোমার বিপ্লবের সভা।' সুধীব হেসে তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'যাও তুমি। আমি চলি অন্যত্র।' আর কোনো কথা না বলে অবনীকে এড়িয়ে সে হাঁটতে লাগলো কার্জন পার্ক মুখো।

এসপ্ল্যানেডের ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়েই একেবারে সামনা সামনি পড়ে গেল সে জয়ন্তীর। সুধীর থমকে দাঁড়ালো। পকেটে মাধুরীর চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ সে যেন ভুলেই গেছলো। কিন্তু সুধীরের পা দুটো এগোতে চাইলো না আব কোন মতে। সুধীরকে দেখেছে জয়ন্তী — ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভীড়ের মাঝখানে যৌবন উচ্ছ্বসিত ওর বলিষ্ঠ ঋজু দেহ, ওর চওড়া চিবুকের দৃঢ় ব্যঞ্জনা আব পরিচিতের সস্মিত হাসি — সবটা কেমন ঘাবড়ে দেয় সুধীরকে। ওব কোথাও কোনো ব্যর্থতার বিষণ্ণতা নেই। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুধীরের — এই মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল আর সে ছেলেদের মতোই এড়িয়েছিল দায়-দায়িত্বের অছিলা তুলে। এমন মেয়েও হয়েছে এখন বাঙলা দেশে — সেজেগুজে বসে থাকে না বিয়েব জন্যে। হঠাৎ সুধীরেব নিজেকে ছোট মনে হয় অফিস ফেরতা ঋজু বলিষ্ঠ এই মেয়েটিব কাছে। নিশ্চয়ই ও পয়সা বাঁচাবার জন্যে ডালহাউসী স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড তক হেঁটে এসেছে।

চুলোয় যাক্। —

সুধীর ঘুবে দাঁড়ালো — দ্রুত মিশে গেল ভীড়ের মাঝখানে। মাধুরীর চিঠি দেওয়া হলো না।

একটু ফাঁকায় এসে থমকে দাঁড়ালো: এখন কোথায় যাবে সে ভাবতে লাগলো। তারপর সিধে হাটতে লাগলো চৌধুরীর রেস্তোরাঁ বারের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে যায় এক পুরুষ আগের সুয়োরাণী ঠাকু'মাকে। কি বলতো সে জয়ন্তীকে দেখলে? বলতো:

'ছি ছিঃ — ও সব মেয়ের স্বভাব চরিত্তির ভালো না।'

আর সঙ্গে পাড়া হাটকানো বিনি পিসী থাকলে বলতো, 'বুঝলে দিদি, ও সব ছেনালপনা। মুখে আগুন হারামজাদীর।'

সামনে চৌধুরীর রেস্তোরাঁ বার। একটা হাঁক ছেড়ে যেন সুধীর ঢুকে পড়লো।

কিন্তু সেই কোণের টেবিল আজ খালি। অথচ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কারুর পাত্তা নেই। সুধীর একাই একটা চেয়ার টেনে বসলো। বসতে না বসতেই পাশের কোন একটা কেবিনের ভেতর থেকে সুন্দর ইংরেজি আবৃত্তি ভেসে আসে — কিছুটা বিষণ্ণ, কিছুটা জড়িয়ে যাওয়া:

Heart! Thou and I are here sad and alone;
I say, why did I laugh? O mortal pain!

হৃদয়ের সঙ্গে কে একা দুঃখে আর যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত? — পরিচিত গলা বহুদিন আগের সেই মাখনের? ঢেউ ভেঙে উছলে পড়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন। সুধীর উৎকর্ণ হয়ে রইলো:

O Darkness! Darkness! ever must I moan,
To question Heaven and Hell and in vain.

কার কবিতা?' স্বর্গ নরক আর হৃদয়ের কাছে কার এই অনন্ত জিজ্ঞাসা? কেন সে কাঁদবে! মনে পড়ছে। আস্তে আস্তে মনে পড়ছে — গোটা অতীত জীবনটা ঘিরে আসছে সুধীরের স্মৃতি-বিস্মৃতি জুড়ে। ভালো ছেলে মাখন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাখন — ব্যর্থজীবন মাখন আর তার মুমূর্ষু কবি কীট্‌স। নেশার ঘোরে তরংগিত হয়ে উঠছে প্রেতাত্মাদের কথা:

Verse, Fame and Beauty are intense indeed,
But Death intenser — Death is Life's high meed.

তন্ময় হয়ে সুধীর আওড়ালো, ঠিক। মৃত্যু কি গভীর! মৃত্যুই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। হায় জয়ন্তী-মাধুরী — শহর কলকাতা! ঝড়ে ছেঁড়া স্বপ্ন! Death intenser — মৃত্যু কি গভীর!

এই সময় চৌধুরী বেরিয়ে এলো একটা কেবিন থেকে। সুধীরকে দেখে লুফে নিল, 'আরে, তুমি যে! এসো এসো — সবাই আছে এখানে।' বলে কেবিনের পর্দা তুলে দেখালো।

সুধীর বললো, 'ব্যাপার কি আজ!'

চৌধুরী বললো, 'মাথন রেসে আজ মোটা টাকা লুটেছে। এসো — এসো।'

সুধীর ঢুকলো কেবিনে।

আবার সেই হারিয়ে যাওয়া — দীর্ঘদিন পরে, দীর্ঘদিন ঘুরে, কিছুক্ষণ জুড়ে। সমস্ত কিছুকে অবিশ্বাস করে কতদিন পারে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে? সুধীরও তো পারে নি। পারলো না। দীর্ঘদিনের অতিক্রান্ত একটা জীবন ফুরিয়ে শেষ হয়ে কেবিনের এই এক আধ আলো-অন্ধকার কোণায় পড়ে আছে আবর্জনার মতো। রেসে জেতা টাকায় ওঠে মত্ত মুখরতা — যতোক্ষণ, যতো রাত পর্যন্ত না তার পাই-পয়সা খরচ হয়ে চৌধুরীর কাছে দেনা হয়ে যাচ্ছে। তবু নিজেকে নিঃশেষ করা এই জীবন কিছুক্ষণের জন্যে সুধীরের সমস্ত প্রশ্নকে কোথায় ভুলিয়ে দেয়।

সুধীর বার বার অনুরোধ করে, 'বলো বলো মাথন — তোমার কবিতা বলো। বহুদিন পরে শুনছি। জীবন। সবার বড় ব্যাধি টিউবার-কুলোসিস নয়, প্রিয়া মরে যাওয়া নয় — জীবন। তাই না তারক তোমার সেই তত্ত্ব' ...

তারক নেশার ঝোঁকে বললো, 'তত্ত্ব নয়, সত্য। এ জীবন-বীজাণুর হাত থেকে বাঁচতে হলে মৃত্যু পান করো। Death is Life's high meed.'

সুধীর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক ঠিক। ভুলে গেছলাম। আমি ভুলে গেছলাম।'

তারক বললো, 'ভোলা নয় — তুমি বিশ্বাস করোনি।'

মাখন চাপা গলায় বললো, 'অবিশ্বাসী! দলত্যাগী! তুমি কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে না। জীবন না — মৃত্যুও না।'

দেখতে দেখতে মদের বোতলগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে টেবিলের ওপরে এসে। শুধু এই কেবিনের কোণটিতে নয় — সারা হলে তখন কাচের জল-তরংগ শব্দ ঝিনিক দিয়ে উঠছে। জড়ানো কাৎরানি আর নারীকণ্ঠের কচিৎ চলানো চলানো কথা। এর মাঝখানে সুধীর যেন সারা সন্ধ্যো রাতটা খুঁজলো তার হারানো বিশ্বাসকে — যে কোনো একটা প্রাণপূর্ণ অবলম্বনকে। হোক তা অপচয়। মানুষের একটা অপচয় দরকার হয়ই। কখনো তা বিশুদ্ধ খরচা, কখনো কিছু বা পাওয়া দাম — তা অর্থগত বা হৃদয়গত, যাই হোক। নিরংকুশ বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসকে দিয়ে কতদিন সে ঠেকিয়ে রাখবে দ্বন্দ্ব-মুখর এ রাজধানীর জীবন?

আড্ডা শেষ করে যখন বেরুলো সুধীর তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। কলকাতার হট্টগোল তখন ঝিমিয়ে গেছে! পথের দু'পাশে নিঃশব্দে আলো-গুলো জ্বলে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হয় তার, ওগুলো অকারণ। গড়ের মাঠের অনাবশ্যক আকাশে এক ফালি চাঁদ বাঁকা ঠোঁটে চাপা হাসির মতো। সেও অকারণ। জয়ন্তীকে লেখা মাধুরীর চিঠিটায় একবার হাত দিয়ে দেখলো — মনে হলো, সেটাও অকারণ। বিড বিড ক'রে আবৃত্তি করলো:

'মৃত্যু কি গভীর।··· Death intenser.'

তারপর সেই কানা-গলি ··· বাড়ী। সারা গলি ঘুমন্ত। শুধু মাধুরী জেগে আছে। সুধীরকে দরোজা খুলে দিল নিঃশব্দে। মুখটা সজল করুণ।

মাধুরীকে এড়াবার জন্যে সুধীর বললো, 'আমি আজ আর কিছু খাব না মাধুরী।' বলেই সে নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।

পেছনে মাধুরী একটু তাকালো অবাক হয়ে।

সুধীর ততক্ষণে সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল মাধুরী। ছেলেমেয়েদের এক পাশে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো সে। সুধীরের আচরণ হঠাৎ রূঢ় মনে হয়। কে জানে, শরীর হয়তো খারাপ।

সারা বাড়ী ঘুমে নিঝুম। তবু কান পেতে শুনলো সে ঘুমন্ত মানুষগুলির নিরুপদ্রব নিঃশ্বাস। তারপর বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে সুধীরের ঘরের দিকে। দরোজা খোলা। সুধীরের বিছানার পাশে গিয়ে অনেকক্ষণ জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পনে হাত দিয়ে দেখলো — সুধীরের জ্বর-টর হয়েছে কি না।

কিছুই সে বুঝতে পারলো না। হঠাৎ সমস্ত অনুভূতি যেন তার ভোঁতা হয়ে গেছে। আর সুধীর গাঢ় ঘুমে অচেতন। সেও জানলো না কিছুই।

আবার সন্তর্পনে বিছানায় ফিরে গিয়ে সারা ঘুমন্ত বাড়ীটাকে বড় রূঢ় বড় অনাত্মীয় মনে হয় মাধুরীর।

সকালে চা খাওয়ার সময় সুধীর নিজেই যেচে বললো, 'জয়ন্তীকে কাল তোমার চিঠিটি দিতে পারিনি মাধুরী — আজ দেবোই।'

মাধুরী বললো, 'জানিনে সে আসবে কি না আর এ বাড়ীতে — অনেক দিন আসেও নি। তাই আসতেও বলিনি। তবু বললে যদি সে আসে' —

অর্থাৎ তাকে আসার কথা যদি সুধীর বলে। মাধুরীর ইংগিত বুঝতে পেরে সুধীর চটপট ক'রে বললে, 'কি দরকার মাধুরী।' তারপর অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললে, 'তোমার সেই সেপাই গেল কোথায় — তাকে দেখছিনে যে।'

মাধুরী বুঝতে না পেরে বললো, 'কে?'

'সেই যে তারামনি!'—

মাধুরী বললো, ' কাল বিকেলে একটা মিছিলের পেছনে পেছনে কোথায় চলে গেল — আর তো ফিরে এলো না।'

'যথাস্থানে চলে গেছে তা হলে। চুলোয় যাক' — বলে সুধীর সেদিনের খবর কাগজগুলো টেনে নিয়ে দেখতে লাগলো।

মাধুরী বললো, 'আজ তা হলে মনে ক'রে জয়ন্তীকে চিঠিটা দেবেন সুধীরদা।'

'নিশ্চয়ই। আজ আর ভুলি।'

বললো বটে সুধীর কিন্তু জয়ন্তীর সেই অতি পরিচিত সস্মিত হাসি, তার অফিস-ফেরতা কর্মঠ ভঙ্গী দেখে সুধীরের পৌরুষ যেন দমে যায়। মাধুরীর কান্না ভেজা মুখটাকে যেমন সে এড়াতেও পারে না তেমনি জয়ন্তীর দীপ্তভঙ্গী সে মুখোতেও পারে না। তবু সেদিন সে ডালহাউসী স্কোয়ারে অফিস পর্যন্ত গিয়ে চোখ কান বুজেই যেন মাধুরীর চিঠিখানি ধরে দিয়ে বললো, 'তোমার চিঠি জয়ন্তী।'

মুখ আঁটা খাম এবং সুধীরের দিকে একবার চেয়েই মুখের রং বদলাতে সুরু করেছে হঠাৎ জয়ন্তীর। সুধীর ব্যাপারটা আঁচ করে বিব্রত বোধ করলো — কে জানে, হয়তো জয়ন্তী ভাবছে সুধীরই কাতরোক্তিপূর্ণ কোনো চিঠি দিচ্ছে যা সে মুখে বলতে পারেনি। সুধীর বললো :

'মানে মাধুরী চিঠি লিখেছে তোমাকে।'

'ও।'

সহজ হলো জয়ন্তী।

'চলি আমি তা হলে' — সুধীর যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো।

জয়ন্তী বললো, 'দাঁড়ান। আপনার একটু সাহায্য নিতে হবে আমার।'

'আমার সাহায্য?' সুধীরের আড়ষ্টতা যেন বেড়ে গেল।

জয়ন্তী হাসলো কৌতুকে। বললে, 'কাল হঠাৎ আপনাকে দেখে ডাকতে যাব — এমন সময় আপনি কোথায় হারিয়ে গেলেন ভীড়ের মধ্যে।'

মনে মনে বললে সুধীর, হারাইনি — বরং পালিয়েছিলুম। বিব্রত সুধীর জিজ্ঞেস করলো, 'সাহায্যটা কি ধরনের?'

জয়ন্তী বললো, 'এক জায়গায় একা যাওয়ার সাহস হচ্ছে না আমার — অথচ গিয়ে খোঁজ নিতেই হবে। একজন শক্ত লোক দরকার সঙ্গে।'

'আমাকে শক্ত লোক ঠাওরানোর হেতু?' সহজ কথার ধারায় সুধীর সহজ ভাবে হেসে বললো।

'কিন্তু আমার যে যাওয়া দরকার — বড দরকার।' জয়ন্তী যেন নিজের মনে নিজেকে জোর দিয়ে বলে উঠলো, 'একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।'

সুধীর বললো, 'বুঝতে পারছিনে কিছুই। তবু চল — কোথায় তোমার দুঃসাহসিক অভিযান, যাব।'

জয়ন্তী বললো, 'চলুন — যেতে যেতে বলবো সব কথা। আমার একটি বান্ধবী — খুবই বিপদে পড়েছে। কি বলবো তাকে — কিছুই ভেবে উঠতে পারছিনে। অথচ চিঠি লিখেছে সে যেতে।'—

সুধীর হেসে বললো, 'সমস্যাটা গুরুতর, আঁচ করতে পারছি — কিন্তু সেটা যে কি, তা-ই বুঝতে পারছিনে।'

'বলছি।'—

সে পারুলের কথা। সন্তান সম্ভাবনায় অস্থির তাকে সেই যে দেখে এসেছিল — আর যায়নি জয়ন্তী। তার বাড়ীর ধর্মোন্মাদ পরিবেশে কে জানে সে কেমন ক'রে লড়াই ক'রে যাচ্ছে। এতদিনে নিশ্চয়ই সব কিছু টের পেয়ে গেছে তার মা-বোনেরা, স্বামীজীরা। পারুলের সেদিনের সেই ভীরু পাণ্ডুর মুখ, আর তার মায়ের ধর্মোন্মাদনা ও নিষ্ঠা, বিশেষ করে পারুলের সেই প্রেমের ব্যাপারে তাঁর হিংস্র বিরূপতা — সবটা মিলে যে পরিবেশ এখন রচিত হওয়ার সম্ভাবনা — তার মধ্যে একা যেতে সাহস নেই জয়ন্তীর। কে জানে, তাকেই হয়তো তারা খামাকা অপমান করে বসবে।

সব শুনে সুধীর বললো, 'আমি সঙ্গে গেলে অপমান করতে তারা কিছু পেছপা হবে বলে তো মনে হয় না।'

জয়ন্তী বললো, 'কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে আসতে পারবো তো।

আর তা ছাড়া অন্য ভাবেও আপনাকে কাজে লাগতে পারে — যদি চলে আসতে চায়।'—

'চলে আসবে? কোথায় যাবে?' সুধীর থতমতো খেয়ে বললো।

'কেন — নিজের খরচ সে নিজেই তো চালাতে পারবে। ঘর সংসার করবে বলে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়তি মাইনে সে অনেক দিন ধরেই জমিয়ে আসছে। আজ আমি তাকে সেই কথাই বলবো।'

অত্যন্ত সহজে বলে গেল জয়ন্তী — নারী জীবনের, তার সম্মানের যেন কোনো সংকট, কোনো জটিল প্যাঁচ নেই। ওর ঋজু বলিষ্ঠ দেহের মতোই লোভনীয় মনে হয় ওর মতামত। অবাক হয় একটু সুধীর — হঠাৎ মনে হয়, এত সিধে — এত বলিষ্ঠ একটি মেয়েকে এতদিন পরে যেন নতুন ক'রে সে চিনছে। চিনতে কষ্ট হতো না তার — যদি জয়ন্তী তার বান্ধবীর দুর্ভাবনায় কেঁদে ফেলতো, অথবা ইতর ভাষায় গালাগাল দিত, অথবা গর্ভের সেই পাপকে বিনাশ করবার কথা বলতো। চুপ ক'রে সুধীর জয়ন্তীর পাশে বসে রইলো। ট্রাম ছুটে চলেছে উত্তর মুখো। প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করেছিল সুধীর জয়ন্তীর পাশে বসে, তার সহজ ও সংকোচহীন আচরণে — যেন কোনো কিছুই ঘটে যায়নি তাদের মধ্যে। তারপর সে কৌতুক বোধ করেছে: হিসেব মেলেনা যার সঙ্গে — তার সঙ্গে চলেছে সে কোনো একটি সন্তান-সম্ভবা কুমারীকে উদ্ধার করতে! অপ্রত্যাশিত এ ঘটনা যেন ভাগ্য বিড়ম্বনার মতো।

সুধীরের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি একটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জয়ন্তীর চোখ এড়ালো না। বললো, 'হাসছেন যে?'

সুধীর মন খুলে বলে ফেললো, 'আমার দুরবস্থা কল্পনা করে।'

'দুরবস্থা কিসের?'

সুধীর আমতা আমতা করে চেপে যাওয়ার মতো ক'রে বললো, 'আমাদের এই অভিযান। কপালে আজ কি আছে কি জানি। দেখেছি, স্বামীজীরা প্রায়ই ষণ্ডা গোছের হয়।'—

জয়ন্তী অত্যন্ত গুরু গম্ভীর হয়ে বললো, 'তেমন কিছু হবে বোধ হয় না।' তারপর মাধুরীর চিঠির প্রসংগ তুলে বললো, 'কি লিখেছে মাধুরী?'

'কি জানি!'

আর কেউ কোনো কথা বলে না। বোধ হয় চিঠির প্রসংগে বহুদিনের চাপা পড়া সেই হিসেব গরমিলের কথাটা অকস্মাৎ সামনে এসে পড়ে দু-জনেরই। নীরবে তাকে ওরা পাশ কাটিয়ে গেল।

পারুলদের বাড়ির সামনে ওরা যখন এসে পৌছলো তখন বিকেলের ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। গোটা বাড়িটা মুখ-গোমড়া — নিঝুম। কিন্তু জয়ন্তীর কড়া নাড়ার আগেই দরোজা খুলে গেল। সামনে পারুল। হাঁপাচ্ছে। জয়ন্তীকে রাস্তায় দেখে ছুটে এসেছে।

পারুল বলে উঠলো, 'এসে গেছিস জয়ন্তী! কাল সারাদিন তোর অপেক্ষা করেছি।'

জয়ন্তী পারুলের মুখেব দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলো — কোথায় যেন তার মস্ত বড একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেদিনের ফোঁপানো পারুল এ নয় — যার পাশ থেকে সে নিরুত্তরে সেদিন উঠে গিয়েছিল। বরং ওর রুগ্ন মুখে কোথায় আজ চাপা আছে একটা দৃঢ়তা। জয়ন্তী কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল। সুধীর দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে সপ্রতিভ হয়ে।

পারুল বললো, 'আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি জয়ন্তী। বলছি তোকে। আগে একটা গাড়ী ডেকে আন।'

এরকম একটা অবস্থার জন্যে জয়ন্তী আগে থেকেই মনে মনে তৈরী ছিল। ফিরে তাকালো সে সুধীরের দিকে। আর ঠিক সেই সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালো পারুলের মা। জয়ন্তী থতোমত খেয়ে তাঁর দিকে তাকালো চোখ তুলে।

তিনি ডাকলেন, 'তোমার জন্যেই ক'দিন অপেক্ষা করছিলুম জয়ন্তী। আমার ঘরে এসো — আমার ক'টা কথা বলবার আছে।'

সুধীর বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো — ওরা সবাই চলে গেল ভেতরে।

পারুল ঢুকলো না মায়ের ঘরে। বিব্রত জয়ন্তী শুধু অনুসরণ করলো মাকে।

প্রথমেই মা ডুকরে উঠে বললেন, 'এ কি ভীষণ পরীক্ষায় ভগবান আমাকে ফেললেন মা! এত সব ঘটবার আগে মরণ হলো না আমার কেন?'

এই মায়ের ভয়ই করেছিল জয়ন্তী। ভয় করেছিল তাঁর অভিসম্পাত মেশানো কান্না।

মা বললেন, 'তুমি এসেছ — ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে যাও মা, কত বড় পাপ — কত বড় কলংক ও নিয়ে এলো এ বংশে। এখন বলো মা — এ নরক থেকে আমি কেমন করে উদ্ধার পাই।'

জয়ন্তী নীরব। কি বলবে — কেমন ক'রে বলবে, তাই ভাবছে চুপ ক'রে।

মা আবার বললেন, 'ব্যাপারটা জানার পর থেকে আমার তো আর চোখে ঘুম নেই মা। শেষে ঠিক করলুম, কোনো ডাক্তারকে ধরে আমার বিপদের কথা বুঝিয়ে পেটের ও পাপকে মুছে ফেলি।— তা সর্বনাশী মেয়ে বেঁকে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত ও যে এই রকম একটা কেলেংকারী ক'রবে তা আমার আগেই মনে হয়েছিল। তাই সাবধান করেছিলুম ওকে।'—

'জয়ন্তী!'—

জয়ন্তী চোখ তুলে তাকালো — পারুল এসে দাঁড়িয়েছে। ওর রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে রক্তের ঝলক। শুকনো গলায় বললো, 'তোর সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছেন — আমি তাঁর সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছি — তুই আয়।'

'কোথায় যাবি!' মা রুখে উঠলেন বাঘিনীর মতো। জয়ন্তীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে বুঝিয়ে বলো তো মা — ও কী করেছে! স্বামীজীরা এ-ও বুদ্ধি দিলেন, বেশ তো — ছেলে না হয় ওর বেঁচেই রইলো, কোনো অনাথ আশ্রমে রেখে দিলেই হলো। তুই মুক্ত হ' ও পাপ থেকে!'—

'অসহ্য — আমি আর পারছি না জয়ন্তী।' চিৎকার ক'রে উঠলো

পারুল — তাকালো মায়ের দিকে রুখে। বললো, 'কাকে তুমি পাপ পাপ করছো মা! আমার ছেলে আমার পাপ হবে কেন! আমি জানি, তোমরাও জানো — তার বাবা ছিল, এখন নেই, মারা গেছেন হয়তো। কেন সে আমাকে ছেড়ে থাকবে? কেন তাকে অনাথ আশ্রমে বিলিয়ে দেবো? কেন তার মা-ও থাকবে না, বাবাও থাকবে না!'

মা অসহ্য ক্রোধে শুধু বললেন, 'শোনো কথা জয়ন্তী — শোনো কলংকিনীর কথা।'

'তোমাদের মতো প্রথমে আমার এটা কলংকই মনে হয়েছিল বটে,' পারুল দম নিয়ে বললো, 'তারপর অনেক ভেবে দেখেছি, কলংক কেন — এ আমার মহাপুণ্য। বলে দিও তোমার স্বামীজীদের।'

পারুল কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল।

মা কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওকে বোঝাও জয়ন্তী। ও তো মুখ পুড়িয়েছে। আমার আরও দু'টি মেয়ে আছে — এখন বলো তো, তাদের দশা কি হবে! সমাজে কেমন ক'রে মুখ দেখাবো আমি!'

পারুল ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'যতোদিন পেরেছি, আমার দুই বোনকে খেটেখুটে লেখাপড়া শিখিয়েছি। আজ যদি তারা আমার অবস্থা দেখে ঘেন্না করে — করুক। আমি জানি — আমি কোনো পাপ করিনি। আমি যা চেয়েছি তাই আমি পেয়েছি। তাই নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।'

একটি স্যুটকেশে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছিল পারুল। নিজের ঘরে গিয়ে স্যুটকেশটা নিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

তার পরের বোন যুঁই ডাকলো পেছন থেকে, 'দিদি ভাই! আমি যাব?'

যেতে যেতে বলে গেল পারুল, 'দরকার হ'লে তোকে খবর দেবো — তখন যাস।'

জয়ন্তী মায়ের দিকে মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে তাকালো। তারপর বললো, 'আমি যাই মাসীমা। ও যেমন করে ছুটছে ঝোঁকের মাথায় কোথায় মুখ থুবড়ে পড়বে তার ঠিক নেই।' বলে আর কোনো কথার অপেক্ষা না রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

অনেকখানি এগিয়ে গেছে তখন পারুল আর সুধীর। সুধীরের হাতে স্যুটকেশ। জয়ন্তী জোরে হেঁটে এসে ধরলো ওদের।

সুধীর ফিস ফিস করে বললো জয়ন্তীকে, 'গাড়ী করা দরকার। তোমার বন্ধুর মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে — কাঁপছে, টলে পড়ে না যায় রাস্তায়।'

জয়ন্তী বললো, 'গাড়ী ডাকুন।'

একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠলো ওরা। পারুল এক কোণে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজলো, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো একটু। তারপর আস্তে আস্তে সর্বাংগ ওর ঝিম ঝিম করে শক্ত হয়ে এলো।

সুধীর ড্রাইভারের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবে?'

জয়ন্তী আচ্ছন্নের মতো বললো, 'আমাদের বাড়ি।'—

মনে মনে বললো সুধীর, ভালো! কানা-গলির আর একটি বাসিন্দা তবে বাড়লো!

ট্যাক্সি ছুটে চললো দক্ষিণে।

পরের দিন মাধুরী জিজ্ঞেস করলো, 'জয়ন্তী আমার চিঠি পেয়েছে সুধীর দা?'

সুধীর বললো, 'কাল তোমার চিঠি দিতে গিয়েই তো এক ফ্যাসাদে পড়ে গেলুম। তোমাকে বলা হয় নি — আমাদের কানা-গলির একটি নতুন বাসিন্দা এলো কাল। সগৌরবে নিয়ে এলুম তাঁকে — জয়ন্তীরই বন্ধু।'

'সে কে ?'

সুধীর সংক্ষেপে পারুলের কথা বললো।

সব শুনে মাধুরী বললো মুগ্ধ বিস্ময়ে, 'সাহস আছে !'

'নিশ্চয়ই আছে। চিরকালই আমি দুরন্ত সাহসী।' সুধীর পরম গাম্ভীর্যের ভান ক'রে বলে চললো, 'শুধু তোমাদের মতোই এক আধজন আমাকে ভুল করে বসে। তাছাড়া —'

মাধুরী আস্তে আস্তে বললো, 'আপনার কথা হচ্ছে না। আমি বলছি ওদের কথা।'

'অ।' সুধীর ভঙ্গী করে বললো, 'আর আমার সাহসটা তোমার চোখে পড়ছে না !'

'সাহস আবার কি ! আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন।' সুধীরের হালকা কথার ধার না ঘেঁষে মাধুরী বললো, 'মেয়েটিকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে।'

'এই সেরেছে।' সুধীর বললো, 'জয়ন্তী একবার তোমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল ফাঁকা কথার আওয়াজে, আবার দেখছি পারুল তোমার মাথা বিগড়ে দেবে।'

মাধুরী চুপ করে রইলো। মনে মনে কিছু ভাবছে — হয়তো পারুলের কথাই। ওর চোখে দূরান্তের ছায়া। একটু পরে আবিষ্টের মতো বলে উঠলো, 'ঠিকই করেছে। তা'ছাড়া ওরাই পারে।' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'ওদের সব পথ খোলা।'

আবার সেই মাধুরীর দম আটকানো জীবন-কথার পূর্বাভাষ। সুধীর বলে উঠলো তাড়াতাড়ি, 'ওই সমস্ত খোলাপথ মাথা ঠুকছে এসে আমাদের এই কানা-গলিতে — মাধুরী বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না। আমি জানি দু-দিন সবুর করো। কে পারুল, কোথায় সে আর তার ছেলে, সব কোথায় হারিয়ে যাবে।'

মাধুরী বোকার মতো চেয়ে রইলো সুধীরের দিকে।

সুধীর বললো, 'কিছু দিন আগে মোড়ে মোড়ে হঠাৎ লড়াই লেগে গেল, গুলী, বন্দুক, বোমা, ঢিল। আগুন লাগিয়ে দিলে পাড়ার ছোকরারা গোরাদের ট্রাকে। কতো কি কাণ্ড! তারপর সব কোথায় দমচাপা হয়ে তলিয়ে গেল। পারুলের ব্যাপারটাও তাই। কানা-গলির জীবন আমাদের যেমন চলছিল — তেমনি চলবে মাধুরী। দমচাপা হয়ে কোথায় তলিয়ে যাবে পারুল আর তার ছেলে। সমাজে ঠাঁই পাবে না, সংসারেও না। গলির দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে সব। দ্যাখো।'—

এও সত্যি।· · মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। কোথায় কে মাথা ঠেলে উঠেছিল তার প্রেম নিয়ে, তার সন্তান নিয়ে, তার মাতৃত্ব নিয়ে — তাকে দুঃসময়ের অন্ধকার আবৃত করে দিল যেন।

মাধুরী জিজ্ঞেস করলো, 'জয়ন্তী কি আমার চিঠিটা পড়েছে সুধীরদা?'

সুধীর বললো, 'ইতিমধ্যে পড়েছে নিশ্চয়ই। আমি জানি — গুরুত্ব দেয়নি। তুমি চলে যাবে — তাতে তার কি বলো।'

মাধুরী অস্থির হয়ে বললে, 'আপনার যতো আজে বাজে কথা — খারাপ খারাপ কথা।'

'কিন্তু ঠিক কথা।' সুধীর বললে, 'এ কানা-গলি ছেড়ে পালাবার কথা ভুলে যাও, ঢুকেছ যখন একবার। তা ছাড়া কোথায় যাবে? দেশের বাড়ি? সেখানে কিছু নেই আমাদের। যারা আছে তারা তোমায় দূর করে তাড়িয়ে দেবে।'

মাধুরী চুপ করে রইলো।

সুধীর বললো, 'দ্যাখো, আসাম থেকে যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম তখন দেখতে এসেছিলুম রেণুকে, এবং তোমাকেও। কারণ তোমাকে নিয়েই আমাদের যতো গণ্ডগোল। দেখি তো কি রকম মেয়ে! শৈলেনটা

গাধা, তোমাকে চিনতে পারেনি। দেখলুম, তুমি মেয়েটি মোটেই খারাপ নও। থেকে গেলুম।'

মাধুরীর মনের মধ্যে ঝড উঠেছে হঠাৎ; অকারণ আবেগে স্মৃতি বিস্মৃতি, সুখ দুঃখ, এ বাড়ির বিষণ্ণ ক্লান্ত একঘেয়ে জীবনধারাব সহস্র কথা নিয়ে।

সুধীর হালকা ভাবে বলতে লাগলো, 'দিব্যি ছিলুম তোমার তোয়াজে। তোমার শুভেচ্ছায় জয়ন্তী এলো। ফসকে গেলেও মনে মনে ভাবি, এ সংসারে আমার জন্যে কে-ই বা অতোখানি ভাবে বলো। বেশ আছি আমরা সবাই। কোথাও যাওয়ার কল্পনা করো না মাধুরী। এর চেয়ে ভালো আর কোনো জীবন আছে — এ চিন্তাও মনে ঠাঁই দিও না। বুঝলে?'

সুধীরের হালকা কথাগুলো কিন্তু বড গভীব হয়ে বাজছে মাধুবীর মনে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা ভারি ভারি মনে হয়।

সুধীর তেমনি করে বললো, 'যেদিন খুব দম আটকে আসবে, ব'লো — বেড়িয়ে আনবো। অথবা সিনেমা দেখো। অথবা ফুল কিনো। অত ভালোমানুষ সাদাসিধে মেয়েটির মতো মুখ শুকনো করে না থেকে একটু সাজগোজ কোরো। এমনি করে এই কানা-গলিব শহরের মানুষ সবাই বাঁচে। দিন কাটায়। তুমি থাকো — আমার একনিষ্ঠ সাকরেদ হও, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো। কোথাও যেও না।'—

সুধীরের কথায় হালকা ভাব যতোই থাক মাধুরীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে শেষ পর্যন্ত। এ সংসারের নিঃসঙ্গ একটি জায়গা আছে মাধুরীর, এ বাড়ির বউ হয়ে আসা তক, এই জায়গাটি সে নিজেই সৃষ্টি করে তুলেছে। সেইখানে জয়ন্তী একদিন তার ভাবী জীবনের কল্পনা দিয়ে ঝংকার তুলেছিল, আজ সুধীরও তাকে মুখর করে তোলে।

মাধুরীর গলা কেঁপে উঠলো আবেগে। বললো, 'কোথাও যাব না সুধীরদা আর।'

'হ্যাঁ, কোথাও যেও না। অবিশ্যি কোথাও তোমার যাওয়ার জায়গাও নেই।' সুধীর হেসে বললো, 'আসাম থেকে দেখতে এসে থেকে গেলুম তোমার শুভেচ্ছার লোভে। আর তুমি পালাবে? থাকো তুমি — শৈলেন গাধাটাকেও ফিরিয়ে আনবো, তোমাকে চিনিয়ে দেবো।'

মাধুরী চুপ ক'রে আছে। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে একটা ঠেলে ওঠা আবেগকে চাপছে প্রাণপণে। সমস্ত অবাঞ্ছিত অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ একটি পরম আত্মীয়ের কলভাষণে সমগ্র সত্তা যেমন ক'রে ওঠে — তেমনি ক'রে সুধীর মাধুরীকে বিহ্বল ক'রে তুলেছে।

সুধীর সার্টটা গায়ে দিতে দিতে বললো, 'জয় হোক আমাদের কানা-গলির। ঘুরে আসি — একটু কাজ আছে।'

সুধীর বেরিয়ে গেল।

এই লোকটির চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হলো তার, এই লোকটা তাকে সুখী করতে পারতো। বিস্মৃত স্বপ্নগুলো সব মনে নেই — তবু মনে হয়, সেগুলো হয়তো একেবারে ব্যর্থ নয়। অবিবাহিত এই লোকটার এলোমেলো নোংরা করা ঘরটা গুছোতে গুছোতে তার চোখে জল এসে পড়ে। আর সে নিজেকে দমন করে না।

শুধু এ ঘর থেকে বেরোবার আগে চোখ দুটো ভালো ক'রে মুছে নেয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডুব দিতে যায় তার সংসারের কাজে। ঘর থেকে বেরিয়ে সবটা তার বড় রুক্ষ আর একঘেয়ে মনে হয়।

নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো মাধুরী। সন্ধ্যে হয়ে গেছে — ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। সবটা অন্ধকার।

সেই অন্ধকার থেকে হরেন কথা বলে উঠলো। বিছানায় সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। তার দীর্ঘনিশ্বাস একটা কেঁপে উঠতে শুনলো মাধুরী।

হরেন বললো, 'এলে।'

মাধুরী চমকে তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললো। বললো, 'তুমি কতক্ষণ এসেছ ?'

'অনেকক্ষণ মাধুরী।'

'ডাকোনি তো !'

হরেন ম্লান হেসে বললো, 'তুমি গল্প করছিলে — তাই আর ডাকিনি।'

মাধুরী অপরাধীর মতো চাইল হরেনের দিকে। অফিস থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফেরা আধবুড়ো এই লোকটির দিকে চেয়ে ভয়ানক অপরাধী মনে হ'ল তার নিজেকে। এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে যাবে সে এখুনি ছাত্র পড়াতে।—এতক্ষণ হয়তো অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।

হরেন ম্লান হেসে বললো, 'শুয়ে শুয়ে কতো কি ভাবছিলাম মাধুরী। শৈলেন চলে গেছে। রেণু নেই। তুমিও চলে যেতে চাও। সব কেমন যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে।'

মাধুরী চুপ ক'রে চেয়ে রইল।

হরেন বললো, 'বুড়ো হয়ে পড়ছি — নিজেও ভেঙে পড়েছি, তাই ভাবছিলুম। তোমাকে বিয়ে ক'রে অযথা তোমাকে টেনে এনেছি বুড়ো মানুষের নিরস জীবনে।'

মাধুরী শুকনো গলায় বললে, 'এ সব কথা বলছো কেন ?'

'মনে হচ্ছিল।— সুধীরের ঘরে যখন গল্প করছিলে, মনে হচ্ছিল এই সব,' হরেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'যাই — টিউসানীটা সেরে আসি।'

'চা খাবে না ?'

'থাক দেরি হয়ে যাবে।'

হরেন বিষণ্ণ ক্লান্ত দেহটা যেন কোন রকমে জোর ক'রে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বুড়ো মানুষের মতো।

মাধুরী চেয়ে রইলো ফ্যাল্ ফ্যাল ক'রে। ওর চোখে ভয় — ওর চোখে

অপরাধ : কে জানে কি ভেবেছে হরেন। তার সমস্ত কথার মাঝখানে, চাপা থাকলেও, ফুটে ফুটে বেরিয়েছে হেরে যাওয়া একটা পুরুষের অভিমান। সে স্ত্রীলোক — সে বোঝে, হেরে যাওয়া অক্ষম পুরুষের ঈর্ষা কি। তা জলে ওঠে না — ধুঁইয়ে মরে।

তারপরে তার মনে হয়েছিল, এর পরে — এই ধোঁয়ার মধ্যে সে দিনের পর দিন কাটাতে পারবে কি ? একদিকে সুধীর — আর একদিকে ভেঙে পড়া বুড়ো মানুষের মতো এই হরেন আর তার আফশোস।

এই কিছুক্ষণ আগেই সে সমস্ত মন ও প্রাণ দিয়েই বলেছিল, কোথাও যাবে না সে। রুক্ষ অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে পেয়ে গেছে একটি সহৃদয় অবলম্বন, তার বাঁচার সামান্য মাত্র মূলধন। কিন্তু এখন মনে হলো, পালাতে হবেই তাকে।

সেই দিন রাতেই সে তার বাবাকে চিঠি লিখতে বসলো।

হরেন জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চিঠি লিখছো ?'

মাধুরী মুখ না তুলেই বললো, 'বাবাকে আসতে লিখছি।'

হরেন আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বুঝতে পারলো — কেন লিখছে। তাদের দেশের বাড়িতে যাওয়া তার না ঘটলেও বাপের বাড়িতে যাওয়ার পথ খোলা। হরেন ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইলো — যেন অপেক্ষা করতে লাগলো নিঃশব্দে মাধুরীর চিঠি শেষ করার জন্যে।

চিঠি শেষ হলো এক সময়ে। মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খাম বন্ধ করলো। হরেন চেয়ে চেয়ে দেখছে ওর স্তব্ধ করুণ মুখ — ওর দীর্ঘশ্বাস। আস্তে আস্তে বললো, 'রাত হয়েছে — এবার শুয়ে পড়ো।'

কথা ক'টা করুণ মিনতির মতো শোনায়। মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে তাকালো মাধুরী হরেনের মুখের দিকে : সেই ক্লান্ত জীর্ণ পরিশ্রান্ত একটি মুখ — চোখে তার সেই সেদিনের নিঃশব্দ আহ্বান। রুক্ষ জীবনে সে একটি

স্ত্রীলোকের সেবা চায়, প্রেম চায় — তার ছেলে চায় — আনন্দ চায়। চোখের এ ভাষা তার বহুদিনের পরিচিত।

বড় অসহায় মনে হয় মাধুরীর ওই আহ্বানের সামনে। নিরুপায়ের মতো সে উঠে দাঁড়ালো। তাকালো একবার ঘরের দিকে। মেঝেময় বিছানা পাতা — ছেলেগুলো গাদাগাদি হয়ে শুয়েছে।

মাধুরী শুকনো গলায় বললো, 'বড় মাথা ধরেছে।' বলে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এসে দাঁড়ালো ছাদে। তখনো সে পেছনে অনুভব করছে একজোড়া ক্লান্ত দৃষ্টি। তার স্বপ্ন, তার কল্পনা, তার ব্যর্থতা আর বিহ্বলতার অতল পর্যন্ত এই দৃষ্টি যেন তাকে অনুসরণ করছে। এ বাড়ির কোথাও তার নিষ্কৃতি নেই।

পারুলকে নিয়ে জয়ন্তীর কয়েক দিন কেটে গেল হৈ-হৈ ক'রে। প্রথম দিন তাকে নিজের বাড়িতে রেখে পরের দিন বেরুলো সহকর্মিনীদের আড্ডায়। টেলিফোনেরই গুটি কয়েক মেয়ে মেস ক'রে থাকে — বাঙালী, মাদ্রাজী আর এ্যাংলো। সেইখানে পারুলের থাকার পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মেয়েরা হঠাৎ একটা নতুন কিছু করার পেয়ে যেন মেতে উঠলো।

বাঙালী রাজলক্ষ্মী আর সুপ্রিয়া ছেঁড়া শাড়ী নিয়ে বসলো পারুলের ছেলের কাঁথা সেলাই করতে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডোরা ছুটলো তার বান্ধবী এক ডাক্তারনীকে ডাকতে।

মাদ্রাজী পদ্মজ ব্যস্ত হয়ে পড়লো ওষুধ-পথ্য নিয়ে।

জয়ন্তী আর অফিসের গুটি কয়েক মেয়ে ওদের ইউনিয়নে প্রস্তাব আনলো অর্থ সংগ্রহের।

উৎসাহ ওদের বাধাবন্ধ হারা। গৃহপরিজন-বিচ্ছিন্ন এই কয়েকটি মেয়ে

মেস আর অফিসের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে যেন মরে যাচ্ছিল — কর্মক্লান্ত এ শহরের বিষাক্ত অবসাদের ধোঁয়া গ্রাস করছিল এদের আস্তে আস্তে, কেরানী জীবনের মতো, পুরুষদেব মতো। হঠাৎ এক জীয়ন কাঠির স্পর্শে ওরা যেন বেঁচে উঠলো। নিজের সত্তা ভুলে যাওয়া এক পেষণযন্ত্রের মধ্যে থেকে ওরা হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলো : ওরা নারী — ওরা মা, পারুলের ছেলের মা ওরা সবাই।

ওদের মধ্যে পারুল শুধু মন-মরা। বন্ধুরা চেঁচামেচি করে — হাল্লা করে অফিস থেকে ফিরে এসে, তাস খেলে, রেডিও চলে — কখনো ডোরা নিয়ে বসে তার গীটার। পার্কসার্কাসেব কেতাদুরস্ত ছিমছাম নিঃশব্দ এলাকাটা যেন চমকে ওঠে হঠাৎ ওদের প্রাণস্পর্শে।

প্রতিবেশীরা অবাক হয় : হলো কি ছুঁড়িগুলোর !

সেদিন ডোরা ফিরলো একটু রাত ক'রে — হাতে এক গাদা ফুল। মেসের অন্যান্য মেয়েরা অফিস থেকে আগেই ফিরেছে, ঘিরে বসেছে পারুলকে। জয়ন্তীও আছে ওদের মধ্যে। পারুল শুয়ে আছে বিছানায় — রক্তহীন মুখটা ওর মড়ার মতো ফ্যাকাসে।

সবাই চুপচাপ।

ডোরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো ?'

জয়ন্তী বললে, 'আমরা এসে দেখি — ফিট হয়ে পড়ে আছে ।'

ডোরা বললে, 'নতুন উপসর্গ দেখছি। ডাক্তারকে একবার ডেকে আনি তা হলে।'—

পারুল ক্লান্ত ভাবে বলে উঠলে, 'আজ থাক ডোরা। তুমি একটু বোসো — এই অফিস থেকে এলে।'

ডোরা বসলো একটা চেয়ার টেনে — ফুলগুলো রাখলো পারুলের বুকের ওপরে। বললো, 'কিন্তু তুমি মূর্ছা গেলে কেন বলো ?'

পারুল বিষণ্ণ ভাবে হাসলো।

রাজলক্ষ্মী বললো, 'অনবরত ও ভাববে বাড়ির কথা — মায়ের অভিসম্পাত আর স্বামীজীদের শাপের ব্যাখ্যান।'—

'পাপ!' ডোরা ক্ষেপে যায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো 'তুমি তোমার ছেলের মা হতে না চাও — আমাকে হতে দাও। বুঝলে? যদি আমি পারতুম তা হলে ওই ছেলেকে আমি সগর্বে তিন-তিনবার জন্ম দিতুম এবং পৃথিবীর কাছে বুক ফুলিয়ে বলতুম — দ্যাখো আমার বেবি।'

ওর ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, ওর জামার নিচে পূর্ণায়ত যৌবন — ওব উত্তেজনায় ফুলে ওঠা স্বর্ণাভ কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ — সমস্তটা যেন মুহূর্তে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই সব ক'টি মেয়ের জাগ্রত মূর্ত এক প্রাণখণ্ড যেন সে।

পঙ্কজ পারুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'ছোড — পুরানা ঘরকা বাত ছোড বহিন। মুঝলোগ নয়া ঘর বনায়েঙ্গী।' সেই বহুদূরে কোথায় ছেড়ে আসা তামিলনাদ পল্লীব মেয়েটি বললো আস্তে আস্তে। বিশ্বাসে নির্ভর — দৃঢ়তায় সুস্থির মায়ের মতো।

জয়ন্তী বললে, 'যাই হোক — কাল থেকে ওকে আব একলা ফেলে যেয়ো না কেউ — অফিসে সিফ্‌টে কাজেব ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে।'

রাজলক্ষ্মী বললো, 'ইনচার্জ দেবে তোমাদেব সেই সুবিধে!'

ডোরা বললে, 'ওব ঘাড় দেবে। দবকাব হলে স্ট্রাইকের পথ খোলা।'

তারপর ডোরা জিজ্ঞেস করলো জয়ন্তীকে, 'টাকা কি রকম উঠেছে জয়ন্তী?'

'খুব ভালো।'

সুপ্রিয়া বললো, 'বাইরের কয়েকটি মেয়েও দিয়েছে।'

'শুনছো তো পারুল।' ডোরা বললে, 'এখন ওঠ তো — চলো একটু বেড়িয়ে আসি। গেট আপ — গেট আপ।'

পারুলকে টেনে হেঁচড়ে তুললো ডোরা — বেড়াতে বেরুলো পার্কের দিকে।

রাজলক্ষ্মী পেছন থেকে হেসে বললো, 'তোমার সেই বয় ফ্রেণ্ডটি দু-বার ঘুরে গেছে ডোরা, আবার আসবে বলে গেছে।'

'বলে দিও, আজ আর দেখা হবে না।'—

ডোরা বেরুলো পারুলকে নিয়ে। পেছনে জয়ন্তী।

বেরুবার মুখেই ওদের আর একটি সহকর্মিনীর সঙ্গে দেখা। এসে দাঁড়ালো গুরু গম্ভীর মুখে — হাতে একটি প্যাকেট, কাগজে মোড়া।

ডোরা বললো, 'কি খবর মনিকা — এমন সময়ে!'

'ইউনিয়ান সেক্রেটারী পুলিস হেডকোয়ার্টারে।' মনিকা খবর দিল, 'কয়েকটা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে গেছে — ছাড়া পাবে কি-না জানি না। দুবৃর্ত্তের ছলের অভাব নেই।'

সকলেই স্তব্ধ চোখে চেয়ে আছে মনিকার দিকে।

মনিকা হাতের প্যাকেটটা পারুলের হাতে দিয়ে বললো, 'তোমার ছেলেব জন্যে সে কি পোশাক তৈবী করছিল, শেষ করে উঠতে পাবেনি, তোমায় দিতে বলে গেছে।'

এদের শুভেচ্ছা, এদের উৎসাহ আর নতুন জীবন-চাঞ্চল্যেব মাঝখানে হঠাৎ একটা বিকৃত অমঙ্গল তার অন্ধকার ঘোমটাটা খুলে তাকালো যেন ভ্রূভঙ্গী করে।

ডোরা একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিল ফুসফুসে — যেন হাওয়া বন্ধ হয়ে আসছে চারপাশে। তারপর এগোলো সে পারুলকে নিয়ে।

জয়ন্তী এগোলো ট্রাম স্টপেজের দিকে। বাড়ির পথ। রাত হয়েছে।

এতক্ষণে ক্লান্ত লাগে। সহকর্মিদের ছেড়ে এসে বাড়ির পরিবেশ মনে পড়ে, তার দায় আর দায়িত্ব ··· দারিদ্র্য আর সংসারের ভাঙা চাকায় কাঁধ

লাগানো জীবন। জয়ন্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। পারুলের অজাত শিশুটির সুন্দর কচি মুখটা সে মনে মনে কল্পনা করে, ছোট বোনের সুস্থ শান্ত জীবন আর বাসু।··· বাসু পাশ করে বেরিয়ে আসবে একদিন।···

দ্রুত ধাবমান ট্রামের গতির চেয়েও অসংখ্য অনাস্বাদিত এলোমেলো স্বপ্নের গতি দ্রুত হয়ে ওঠে ওর মনে।

পরের দিন ভোর রাত্রে কানা-গলির নিঃশব্দে ঘুমন্ত একটা অংশ পুলিসের বুটের শব্দে যেন চম্‌কে জেগে উঠলো। ওয়ারেণ্ট আছে — বাসুকে খুঁজতে এসেছে। কিন্তু বাসু কোথাও নেই — তার কাগজপত্রের একটা ইঙ্গিও পড়ে নেই কোথাও। জয়ন্তীর মুখ শুকিয়ে গেছে, ছোট বোনটার চোখে ভয়। বাবা ইষ্টনাম জপ করছেন।

পুলিসের কর্তার সঙ্গে কথা বলতে বেরিয়ে এলো কাকা।

'আপনি সরকারী কর্মচারী, আপনার বাড়ির ছেলেরা এমন সাংঘাতিক ব্যাপারে সব লিপ্ত!'— পুলিসের কর্তা কটকট করে উঠলো কোলা ব্যাঙের মতো।

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?' কাকা জিজ্ঞেস করলে, 'কি করেছে সে?'

'রাষ্ট্রবিরোধী সব অশান্তিকর ব্যাপার।' অফিসারটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, 'জানেনই তো কেবিনেট মিশনের সঙ্গে এখন শান্তিপূর্ণ ভাবে বোঝাপড়া চলছে। আমাদের নেতারা এখন মোটেই চান না — শহরে শহরে বৃটিশ বিরোধী আগুন জ্বলে উঠুক।'

'ঠিক কথা!— নেতাদের মুখ থাকবে না। এ অতি খাটি কথা।' কাকা গলা নামিয়ে বললে, 'কিন্তু শহরে আবার গোলমাল বেধে উঠতে পারে নাকি!'

'এ অবশ্যি কনফিডেনশিয়াল কথা — বলা উচিত নয় কারুকে। তবে আপনাকে শুধু বলতে পারি।' অফিসারটি সগর্বে বললে, 'শহরকে

আমরা জরুরি নিরাপত্তা [আইনের মুঠোয় পুরে ফেলেছি।' বলে হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগলো।

কাকা বোঝালেন, 'নিশ্চিন্ত হোন — এর পরে এ বাড়িতে তার আর আশ্রয় নেই।'

'তাকে আমরা এখন পাই কোথায়? কিছু সন্ধান দিতে পারেন?'

'নিশ্চিন্ত থাকুন — আমি সন্ধান পেলে ধরিয়ে দেবো।'

কাকীমা ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'খোঁজ করে এখুনি ধরিয়ে দাও। জানে কাকার চাকরী, — আছে তারই ডেরায় মাথা গুঁজে আর তলে তলে এই সব! অকৃতজ্ঞ বেইমান!'...

কাকা বললে, 'সে পালালো কখন? রাতে ফিরেছিল?'

'ফিরবে না? খেতে হবে তো?' কাকীমা বললো, 'দেখলুম তো খেয়ে দেয়ে চলে গেল ওপরে। তারপর এখন শুনছি, সে নাকি নেই। তুমি এখুনি গিয়ে খুঁজে দেখ — ধরিয়ে দাও।'

জয়ন্তী শুধু কাঠ হয়ে শুনে গেল সমস্ত কথা। বাসুর এ ব্যাপারে তার বলার কিছুই নেই। সে কাঁদেনি কোনোদিন। আজ ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল যখন তার অতীত আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও কল্পনার কথা, তখন চোখের কোণ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা। চোখের সামনে স্বচ্ছ কাচের মতো দিনগুলো যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মুহূর্তে।

বাসুর ঘরটা খাঁ খাঁ করছে।

কতকগুলো অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে সংঘাতে দিনগুলো যেন ওলোটপালট হয়ে গেল। পারুল, তারপর বাসু। এগুলোকে খাপ খাইয়ে নিতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। এতদিন জয়ন্তী শুধু মুখ বুজে যন্ত্রের মতো সব কিছু করে গেছে। বাড়ির পরিবেশ তাকে বিঁধেছে প্রতিমুহূর্তে, পালিয়েছে পারুলের ওখানে। সেখান থেকে অফিস, অফিস থেকে আবার

পারুলের মেসে। তারপর রাত করে নিজেকে শ্রান্ত অবসন্ন করে বাড়ি ফিরেছে — কোনোরকমে খাওয়াটা সেরে বিছানায় এসে নিজেকে মুহূর্তে সংজ্ঞাশূন্য করে ফেলবার জন্যে।

সামনে পড়লো সপ্তাহে একদিনের ছুটি — তার অফ ডে। মনে পড়লো মাধুরীর কথা। তার চিঠির কোনো উত্তরও দেয়নি সে, দেখা করার কথাও মনে হয়নি এতদিন। মাধুরীর চিঠির আফশোসে ভরা কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো লাইনই শুধু মনে পড়ে তার মাধুরী এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। সেই মাধুরীর সঙ্গে এতদিন দেখা করতে পারেনি বলে নিজেকে তার বড় অপরাধী মনে হয়।

দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়লো সে মাধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। এ বাড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে মনে পড়লো: তার সেই হিসেব নিকেশ চুকে যাওয়ার পর আর আসেনি সে এ বাড়িতে। এই সেদিনের কথা, তবু সমস্ত অতীতটা মনে হয় মুহূর্তে বর্ণহীন মাধুর্যহীন — বহুদূরের।

জয়ন্তী যখন এসে পৌছলো, মাধুরীর তখন বাক্স প্যাঁটরা প্রায় গুছনো শেষ। আর এ দরিদ্র পরিবারে কি-ই বা ছিল তার গুছোবার মতো। একটি ট্রাংক এনেছিল সে এ বাড়িতে নতুন বৌ হয়ে ঢোকার সময়, রেণু সেটা অধিকার করেছিল কয়েক মাসের মধ্যে। তাতে আছে তার পরিত্যক্ত শাড়ি কয়েকখানা, ব্লাউজ, পেটিকোট — টুকিটাকি মেয়েলি জিনিস। তোরংগটা তার গন্ধে ভরা। মাধুরী ছোঁয়নি সেটা। একটা রংচটা পুরোনো তোরংগে ভরেছে তার জিনিসপত্র।

'এলি জয়ন্তী।' মাধুরী বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি টেনে তাকালো জয়ন্তীর দিকে।'

জয়ন্তী বললো, 'আজই কি তুই যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, বাবা এসেছেন নিতে।'

'থাকবি কতোদিন?'

'এই কিছুদিন'—

এই রকম অনির্দিষ্ট উত্তর হরেনকেও দিয়েছে মাধুরী। এবং সে নিজেও ঠিক জানে না — এই কিছুদিন তার কতখানি অনির্দিষ্ট।

জয়ন্তী বললো, 'তোর চিঠি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কেন যাচ্ছিস — কি ব্যাপার, কিছুই মাথায় ঢোকেনি।'

এ বাড়ির কেউই জানে না সে কথা। শুধু জানে, মাধুরী বাপের বাড়ি যাচ্ছে এবং এ কথাটা এমন অভিনবও কিছু নয়। কিন্তু মাধুরীর কাছে যে এটা কতোখানি — এ-ও যেন মাধুরী শুধু এই যাওয়ার মুহূর্তটিতেই বুঝতে পারছে। ভারি হয়ে উঠেছে বুকের ভেতরটা। আশ্চর্য — ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে! মনে হচ্ছে — তার দুঃখ এবং সুখ, তার ব্যর্থতা আর স্বপ্ন, দুই-ই পড়ে থাকছে এখানে। এ বাড়ি থেকে ঠিক বেরুবার মুহূর্তে চোখ তার ঝাপসা হয়ে এলো। সমস্ত কঠিনতা ও সংযম দিয়ে নিজেকে সে কোনো রকমে খাড়া রাখলো।

গলির মোড়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে। সুধীর অপেক্ষা করছে ট্যাক্সিতে। মাধুরী আর তার বাবা ট্যাক্সিতে উঠলো। জয়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

মাধুরী শুকনো গলায় বললো, 'স্টেশনে যাবি জয়ন্তী? যদি কাজ না থাকে'—

'নাঃ, আজ আমার ছুটী। চল যাই।'— জয়ন্তী উঠে বসলো মাধুরীর পাশে।

ট্যাক্সি ছুটেছে হু-হু করে — মুখে এসে লাগছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক। বর্ষার মেঘলা বিষণ্ণ দিন। ওই রকম শহর ছাওয়া একটা বিষণ্ণতা যেন নীরব ক'রে রেখেছে মাধুরীকে। পেছনে পড়ে রইলো কানা-গলি, তার সংসার। মুক্তি তার — সেই বহু প্রত্যাশায় মুখরিত কুমারী জীবনের গ্রামে আবার মুক্তি। কিন্তু মুক্তিটাও কি দম-চাপা, কি বিষণ্ণ!

জয়ন্তী আস্তে আস্তে বললো, 'ভালো ক'রে কোনো কথাই হলো না তোর

সঙ্গে। ক'দিন আগে আসতে পারলুম না রে!' তারপর জয়ন্তী আপশোস ক'রে বললো, 'একটি বন্ধুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো ক'দিন, তারপর আমার ছোট ভাইয়ের নামে এলো ওয়ারেণ্ট। সে যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, কি কিছু হলো, কিছুই জানিনে।'—

এ সব কোনো কথাই স্পর্শ করে না যেন আর মাধুরীকে। সে দূরের মানুষ — এখন কানা-গলির জীবন থেকে অনেক দূরে।

শুধু সুধীর জয়ন্তীর কথার রেশটা টেনে নিয়ে বলে উঠলো ড্রাইভারের পাশ থেকে, 'মাথা ঠাণ্ডা ক'রে নেতারা এখন সম্পত্তি বুঝে নিচ্ছে — গোলমাল হট্টগোল এখন সহ্য হবে কেন?'

তার হালকা কথার আর কোনো সাড়া এলো না।

জয়ন্তী বললো, 'গলিতে আজ কাল দেখি, অচেনা মুখ ঘোরা ফেরা করে, দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।' গোয়েন্দা বলেই মনে হয়। কি জানি বাসুর যে কি হলো! ধরা পড়লো কি না!'

সুধীর আবার ফুট কেটে বললো, 'ধরা না পড়লেও আমাদের আজিকেলে শান্ত শিষ্ট গলিটির নিরাপত্তা ফিরে এসেছে প্রভুদের নিরাপত্তা আইনের প্রসাদে।'

'নিরাপত্তা!' উদ্ধত বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারলো জয়ন্তী। ওর মুখে চোখে মুহূর্তে ঝিকিয়ে ওঠে ওর ব্যর্থ আক্রোশ। বললো, 'গোরস্থানের নিরাপত্তা!'...

'ওই দ্যাখো, তোমার কথাতেই ধরা পড়ছে, রাষ্ট্র কি বিপজ্জনক অবস্থার ভেতর দিয়ে চলছে!' সুধীর বললো, 'তোমাদের এই ধূমায়িত অসন্তোষ! ঠিক করেছে দাবিয়ে।'

'কত দিন রাখবে!' ফুঁসে ওঠে হঠাৎ জয়ন্তী, 'আমার সংসারের ব্যর্থতা, আমার সংসারের যন্ত্রণা, প্রতিদিনের অমানুষিক দুঃখ'—

সুধীর কথার মাঝখানে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। সেটা এত নিষ্ঠুর লাগে — জয়ন্তী থেমে গেল।

আর কোনো কথা বলে না সে। মাধুরী নীরব। সারা পথটা বড় একটা কেউ আর কথা বলে না। শুধু মাধুরীর বাবা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছেন কয়েকবার — স্টেশনে পৌছতে সময় যাবে কত। ট্যাক্সি এসে ভিড়লো হাওড়া স্টেশনে। ট্রেনের সময় হয়েছে।

মাধুরীর বাবা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন ট্রেন ফেল করবার ভয়ে। নিজেই বাক্স বেডিং টেনে বিব্রত ক'রে তোলেন সবাইকে।

হরেন আগে থেকে এসে টিকিট কেটে দাঁড়িয়েছিল। অফিস থেকে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছে। মাধুরীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বললো, 'গিয়েই চিঠি দেবে। আর — আর' — কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল সে সুধীর আর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে। বললে শুধু, 'আমি তা হলে চলি --- অফিসে আবার দেরি করলে ব্যাটা বড়বাবু চেপে ধরবে।'—

হরেন চলে গেল।

মাধুরী আস্তে আস্তে বললো, 'তোরাও তা হলে যা জয়ন্তী — সময় তো হলো বোধকরি।'

সুধীর তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো মাধুরীর দিকে চেয়ে, 'আমাদের কানা-গলিটা কিন্তু তোমাদের গ্রাম পর্যন্ত জুড়ে আছে মাধুরী – যাচ্ছ যে কোথায়, সে তুমিই জানো।'

'জানি সুধীরদা।' ' মাধুরী শুধু আস্তে আস্তে এইটুকু কথা বললো।

সুধীরের ওপর জয়ন্তী ফুঁসে উঠে বললে, 'রাখুন আপনার কানা-গলির গল্প।'

সুধীর বললো, 'আহ্ হা, মানো না!'

'না।'

সুধীর জিভে একটা চুকচুক শব্দ করলো।

মাধুরীর উদাসীন রক্তশূন্য মুখটার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ পারুলের

মুখটা মনে পড়ে যায় জয়ন্তীর। ওর বিষণ্ণ চোখে সেই আয়ত্তাতীত দুরান্তের ছায়া। সে জানে না — কোথায় কি ঘটে গেল। শুধু বুঝতে পারে — গভীর একটা কিছু ঘটে গেছে কোথায়।

যাওয়ার মুহূর্তে জয়ন্তী মাধুরীর একটা হাত চেপে ধরে আস্তে আস্তে বললো, 'চিঠি দিস।'—

মাধুরী কোনো কথা বললো না, শুধু মাথা নাড়লো। তারপর এক জোড়া দীর্ঘায়ত শুকনো কালো চোখ রাখলো সুধীরের মুখের ওপর।

'জয়ন্তী যা-ই বলুক,' সুধীর হেসে বললো, 'জয় হোক কানা-গলির।'

প্লাটফর্মের বাইরে এসে সুধীর বললো, 'যাক — এখন তুমি কোন দিকে?'

জয়ন্তী মৃদু কণ্ঠে বললো, 'একই দিকে।'

ওরা এসে বাস ধরলো।

পাশাপাশি বসলো ওরা। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। জয়ন্তী তাকিয়ে আছে বাইরে। ওর সেই চৌকো মুখ আর চওড়া চিবুকে অনির্বান বলিষ্ঠতার আভাষ। চেয়ে চেয়ে অবনীর কথা মনে পড়ে যায় সুধীরের: হুবহু সেই আস্ফালিত ভঙ্গী। তবু, ভাই ওর ফেরারী — সমস্ত পরিকল্পনা ওর বিপর্যস্ত, সংসারের ভাঙা চাকায় বাঁধা জীবন। সুধীর খুঁটিয়ে ক্লান্তির বিষণ্ণ রং একটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে ওর মুখ থেকে। আছে — কোথাও নিশ্চয়ই লুকানো আছে। ধরতে পারছে না। কানা-গলির রুদ্ধশ্বাস ভেঙে পড়া জীবনকে একেবারে এড়িয়ে যাবে সে?

বাস ছুটেছে স্ট্র্যাণ্ড দিয়ে দক্ষিণ মুখো — পশ্চিমে জেটির সারি। তারও পশ্চিমে গঙ্গার পীত জলধারা। তার অগাধ জলস্রোতে সেই আদিকালের

বন্ধতা। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়ে সুধীরের — এই রকম আজকের মতো এক মেঘলা দিনে জল বৃষ্টি মাথায় ক'রে বুনো নদীর উজানে ভেসে ভেসে এসেছিল একটি জাহাজ আর দেশী বোটের বহর — সেই আর একদিন। সে কত সাল! ১৬৯০? মনে করতে পারছে না সুধীর।— এসেছিল জব চার্নকের দল। জাহাজ নৌকোর বহর ভিড়লো গঙ্গার পুব তীরে বাদা বন আর সুন্দরীগাছের জংগল ভেঙে। জলা আর জংগলের মাঝখানে বুক চিতিয়ে পড়েছিল গঙ্গার ধার ঘেঁষে উঁচু এই জায়গাটুকু — বড়বাজার থেকে ডালহাউসী স্কোয়ার, তারই এক কোনায় আস্তানা গাড়লো বেনে কোম্পানী, গড়লো বন্দর — তার বেনেতি ব্যবসাকে ঘিরে গড়ে উঠলো সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র — নতুন দেশ, শিক্ষা, সমৃদ্ধি, জেল্লা।··· সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী! মনে মনে শুধালো সুধীর : হায় উদ্ধত বেনের বন্দর — কোন কানা-গলিতে আজ তোমার শেষ? মাধুরী শেষ পর্যন্ত পালালো সেই কবে ফেলে আসা দুয়োরাণী ঠাকুমার দেশে!··· না স্বীকার করুক জয়ন্তী, ওর আস্ফালন ভুয়া। যতোই ফুঁসে উঠুক অবনী আর অরুণ, কানা-গলির মোড়ে দিশী গোয়েন্দা পাহারা আছে। সেই ভাঙা বস্তির মারখাওয়া মানুষগুলোর মতো অন্ধকারে দম-চাপা কান্নায় গোঙিয়ে মরছে জীবন। তবু এ নব সভ্যতার শহর এখনও বাড়ছে — পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে ··· দক্ষিণে ··· দক্ষিণে।··· সেলাম বেনিয়ার বন্দর-নগরী, সেলাম নাও কানা-গলির সুধীর চক্রবর্তীর!

বাস এসে দাঁড়ালো এসপ্ল্যানেডে। সুধীর উসখুস ক'রে একবার ভাবলো, নেমে যাবে কি-না — গিয়ে আড্ডা জমাবে চৌধুরীর রেস্তোরাঁ-বারে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর লাগছে জয়ন্তীর পাশে।— সে যে সেই চুপ ক'রে চেয়ে আছে বাইরে, একটি কথাও বলেনি। এই সময়ে বৃষ্টি নামলো এক পশলা, আর নামা হলো না সুধীরের।

জলে ভিজতে ভিজতে দু'টি মেয়ে উঠলো বাসে। হাতে বই খাতা-

পত্তর — হয়তো কলেজের মেয়ে। ওরা এসে বসলো সুধীরদের সামনের সীটে।

বাস ছাড়লো।

সামনের মেয়ে দু'টি কথা কইছে মৃদুস্বরে — মাঝে মাঝে হেসে উঠছে রহস্যময় উচ্ছ্বাসে, গলা নামিয়ে আবার কি গুনগুন ক'রছে ওরা। বেশবাসে আড়ম্বরহীন আভিজাত্য ও শুচিতা, চেহারায় আঠারো উনিশের আকর্ষনীয় জেল্লা। ওদের কথা মাঝে মাঝে কানে এসে লাগে সুধীরের — কৌতুক বোধ করে।

'এমন মেঘলা দিনে — সারা দুপুর সে কবিতা লিখেছে, নিশ্চয়ই কলেজ যায়নি।'

কবিতা লেখার দিন কি! সুধীর তাকালো বাইরে — মেঘে ঢাকা সারা আকাশ — গোটা মহাশূন্য ব্যাপ্ত করে ঠাণ্ডা প্রশান্তি, গড়ের মাঠে উচ্ছ্বসিত সবুজ বটে। সুধীর কান খাড়া করলো।

'দুপুর থেকে নিশ্চয়ই সে অপেক্ষা ক'রে আছে — আমি গেলেই এসে হাজির হবে।'—

'খুব জমেছে তাহলে।'—

একটু ছলকানো হাসি।

'আমি আমল দিই না।'

'দুঃখ পায় না?'

'তা পায় বৈকি। কবিতা শুনলে সব ভুলে যায়।'

দু-জনেই হাসলো।

সুধীরের ঠোঁটেও ঝিলিক দিল বাঁকা হাসির। আড় চোখে তাকালো জয়ন্তীর মুখের দিকে — সে-ও কান খাড়া করে শুনছে, চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে যেন মেয়ে দু'টিকে। সুধীরের চোখ পড়ায় জোর করে সে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। হঠাৎ ফ্যাকাসে মনে হয় সে মুখটাকে সুধীরের।

মেয়ে দু'টি গুনগুন করছে।

'সেদিন এসে বললে — এমন মেঘলা দিন, নাই বা গেলে কলেজে।'

'সেদিন তুইও কলেজে আসিস নি।'

'ছাড়লো না।'

'কি করলি?'

'কোথায় না কোথায় গিয়ে ভিজে এলুম।'

ভারি মজা লাগছে সুধীরের — এ দু'টি তরুণীর আলাপে। ওদের চোখে প্রেম এখনও কমনীয়, বিচিত্র সুন্দর,— মেঘলা দিনে যাদু ছড়ানো, কবিতায় উষ্ণ হৃদয়ের সান্নিধ্য। কোথায় কোন একটি বোকা কবি স্বপ্নের স্বর্ণাভজাল বুনছে! বাঁকা হেসে জয়ন্তীর দিকে তাকালো সুধীর: সে মুখ তখন বিবর্ণ পাণ্ডুর। চোখ দুটো ক্লান্ত। খুসি হয় সুধীর: ধরা পড়েছে জয়ন্তী — ওর সমস্ত দীপ্তি আর বলিষ্ঠতা চাপা দিয়ে ধরা পড়েছে কানা-গলির জীবন এতদিনে। সুধীর স্বস্তিতে একটু নড়ে চড়ে বসলো। জয়ন্তী হঠাৎ বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। সুধীর ভারি আনন্দেই যেন হেসে উঠলো নিঃশব্দে। জয়ন্তী আবার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলো বাইরে। তবু তার কানে গলে গলে পড়ছে সামনের মেয়ে দু'টির চাপা আনন্দের কাকলী: হঠাৎ জীবনের অগাধ রহস্যের সামনে পড়ে যেন আত্মহারা হয়ে গেছে।

'আরও একদিন কলেজ থেকে পালিয়েছিলি।'

হালকা হাসি।

'ও এলো যে।'—

'কি বললে।'

'কি আর, পাগলামী।'—

'ভালও তো লাগে।'—

মেঘছায়াম্লান গড়ের মাঠের সুদূর সীমান্তে চোখ রেখে যেন খোঁজে

জয়ন্তী — কলেজে পড়া এই পাগল। স্বপ্নের দিন কবে ছিল যেন তার, কোথায় হারিয়ে গেল! পুরানো কলকাকলী — পুরানো ভুলে যাওয়া মুখ, কিছুই মনে করতে পারছে না সে। শুধু মনে পড়ছে, ক্লাস রুমে বসে বহু বহু বহু ··· দিন আগে কোন এক জানালার ধারের একটি সুপারি গাছের মাথার ওপর দিয়ে প্রশান্ত আকাশটাকে দেখতো দূরান্তের স্বপ্নের মতো। তারও বড় ভালো লাগতো এই আকাশকে, এই পৃথিবীকে, জীবনকে,— যদিও জীবন-রহস্য তার হৃদয়ে মুখর হয়ে ওঠেনি তখনো। তবু তো ভালো লাগতো সব!

চোখ বুজলো জয়ন্তী। চোখটা জ্বালা করছে। ক্লান্ত লাগছে: ভ্রষ্ট স্বপ্ন — বিক্ষত জীবন — শ্রান্তিহীন দিন।

'নামবে না?'

সামনে তাদের নামতে হবে। জয়ন্তী সমস্ত অবসাদকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো। সুধীরের ডাকে কেমন কৌতুক মেশানো। জয়ন্তী তাকালো একবার সুধীরের মুখের দিকে মার খাওয়া শান্ত পশুর মতো।

বাস থেমেছে।

ওরা নামলো।

'নির্বোধ!' সুধীর গালাগালি দিল সেই সামনের সীটে বসা মেয়েটির উদ্দেশে, 'গাধা!'

জয়ন্তী কোনো কথা বললো না — শুধু চোখ দুটো যেন ওর চমকে উঠলো। কথা বলতে সাহস হলো না — হয়তো এখুনি লোকটা স্বপ্নহীন ভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতার দম্ভে আস্ফালন ক'রে উঠবে আবার। নীরবে হেঁটে চললো সুধীরের পাশে পাশে তাদের কানা-গলির দিকে।

তখন প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকার গলিটাকে ঘনঘোর ক'রে তুলেছে।

সুধীর গলির মুখে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আঃ, গলিটা কি ঠাণ্ডা — কি নিবিড় শান্তি। তোমাকে কেউ না মানুক — হে কানা-গলি, জীবনে তোমাকে আমি নিত্য স্মরণ করি!'

জয়ন্তী নীরব। হেঁটে চলেছে সুধীরের পাশে পাশে।

এবার গলিটা দু'দিকে বেঁকে গেছে। ওদের ছাড়াছাড়ি হবে।

সুধীর দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'তোমার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না জয়ন্তী। একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে, আমিও দিল্লী চলে যাচ্ছি শিগ্‌গিরই।— কবে ফেরা হবে আবার, জানি না। সঙ্গে নিয়ে গেলুম কানা-গলির জীবন — গুডবাই।'

থমকে দাঁড়ালো জয়ন্তী — তাকালো সুধীরের চোখে চোখে। আশ্চয, ওর ফ্যাকাসে মুখে কখন ফিরে এসেছে রক্তের উচ্ছ্বাস, চোখে ওর দীপ্তি — গোটা ভঙ্গীতে সেই জীবন্ত বলিষ্ঠতা। জয়ন্তী হঠাৎ বলে উঠলো :

'না।'—

'না! মানে!' সুধীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো দীপ্ত জীবন্ত মুখটার দিকে।

'সে কি আমি এই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলবো!'

'কি বলছো তুমি!'—

সুধীর হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

জয়ন্তী আর একটি কথাও বললো না — মুখ নীচু ক'রে এগিয়ে গেল বাঁ দিকের গলি ধরে। সামনের পথটা ওর ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমশ। ক্লান্তিতে জমাট পা দুটোকে কোনো রকমে জোর ক'রে যেন সে টেনে টেনে এগিয়ে চললো।

এ এক সুদীর্ঘ গলি — সংকীর্ণ, অন্ধকার। দু' পাশে নোংরা জীর্ণ বাড়ি। দূরে দূরে গ্যাসের আলো — ধোঁয়ায় অবরুদ্ধ। বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত — শীতে মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা — বসন্তে ধূলি মলিন! কোথায় চলে গেছে কত বছর জয়ন্তীর এই পথ দিয়ে! দুনিয়া জুড়ে কত পরিবর্তন এসেছে — পরিবর্তন হয়নি শুধু দীর্ঘ এই কানা-গলিটার। তবু অন্ধকার সরু এই পথটা দিয়েই এসেছে তার জীবনে স্বপ্নের তরংগ, কতো দিনের পর দিন! সব কি

ব্যর্থ হয়ে গেছে? মন বলে তার — না, কিছুই সে ব্যর্থ হতে দেবে না। অবিশ্বাসী লোক একটার তুচ্ছ সেই পুরানো হিসেব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন হিসেব মেলাবে সে আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে — সংগ্রাম দিয়ে। দিল্লী নয়।

একটু দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখ দুটো ভালো ক'রে ঘসে একবার মুছলো। তারপর এগোলো আবার।
